KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 3007	Place of Publication ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher অমর নাথ চক্রবর্তী
Title সন্দিগ্ধ	Size 7"x9" 17.78x 22.86 c.m.
Vol. & Number ৫/৫ ৫/৭	Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৫০ পৌষ, ১৩৫০
	Condition : Brittle Good
Editor : অমরনাথ চক্রবর্তী	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

মন্দির

৬ষ্ঠ বর্ষ পৌষ—১৩৫০ ৯ম সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীঅনুরূপা দেবী

ধর্ম্মের পথে হোক তোমাদের অভিযান,
কর্ম্মের রথে চড়ি' হয়ো চির আগুয়ান।
হীনতায় বরিওনা, ঝঙ্কারে ডরিওনা
কিছু লাগি করিওনা আত্মারে অপমান,
তর্জ্জিত সিন্ধুর কলকল কলরব।
শিব আজি শবভূত নেচে ফিরে ভৈরব
আর্ত্তসেবায় প্রাণ, হোক চির অভিযান
শব পুনঃ শিব হবে
থেমে যাবে ঐ রব!

আমাদের কালের স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

দুঃখের বিষয় জীবন যত দীর্ঘ হয় স্মৃতির এলাকা তত বেড়ে গেলেও, স্মৃতিশক্তি ততই কমে আসতে থাকে। তাই স্মৃতির মালমশলা ক্রমবর্দ্ধমান, অথচ তার সদ্ব্যবহার করবার ক্ষমতার ক্রমিক হ্রাস, —এই উভয়-সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। তবে, আশা করা যাক্, কাল ছাঁকনির কাজ করে; অর্থাৎ যা-কিছু বর্জ্জনীয় তা বিস্মৃতির ফাঁকে গলে পড়ে গেলেও যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু খাঁটি মাল।

আমাদের কাল বলতে সঙ্কীর্ণভাবে বোঝায় আমাদের পারিবারিক কাল। কেননা নানা কারণে আমাদের সমাজে আল্‌গা হয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন ছেলেবেলায় অত শত বুঝতুম না; কিন্তু এখন বুঝি যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মেয়েদের সেকালেও (১৯শ শতাব্দীর মোটামুটি শেষার্দ্ধে, অর্থাৎ প্রায় একশ' বছর আগে) যে-পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হত, সেটা তাঁদের সমকক্ষ ও সমকালীন সমাজে সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল না। আমার মা ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আট বছর বয়সে যশোরের বাপের বাড়ী ছেড়ে অনুমান ১৮৬০ খৃঃ-এ কাঁদতে কাঁদতে জোড়াসাঁকোর শ্বশুরবাড়ীতে আসেন। তার আগে যশোরের পাঠশালায় তাঁর হাতে-খড়ি হয়েছিল এবং দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (৯০ বছর বয়সে ১৯৪১ খৃঃ-এ তাঁর মৃত্যু হয়) এমন মুক্তার মত হস্তাক্ষর তাঁর ছিল, যা' একালের পাশ করা মেয়েদের মধ্যে দুর্লভ। কেন যে আজকালকার দিনে হাতের লেখা সুন্দর করবার দিকে তেমন ঝোঁক দেয় না কে জানে। আমার ত মনে হয় যে সাধারণ জীবনের কাজ থেকে পরীক্ষা পাশ পর্য্যন্ত সবদিকেই তাতে সুবিধে হয়। ভাল হাতের লেখা কাগজ দেখলে কি পরীক্ষকের বেশি নম্বর দিতে ইচ্ছা করে না? চিঠি পড়তে বেশি ভাল লাগে না বা কম বিরক্তি বোধ হয় না?

মাতৃদেবীর কাছে শুনেছি যে খড়দার মা-গোসাঁই এসে তাঁদের আমলে বাড়ীর ভিতরে যে শিক্ষা দিয়ে যেতেন তা' ছাড়া, ঘরে নিজেদের দেবর প্রভৃতির কাছেও তাঁরা গল্পপড়ানোচ্ছলে ইংরিজী বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা পেতেন। পিতৃদেবের ত স্ত্রীশিক্ষার দিকে, স্ত্রীস্বাধীনতার দিকে এমন প্রবল ঝোঁক ছিল যে, বিলেতে গিয়ে ও সে বিষয়ে-স্বপ্ন দেখতেন; আর পুরণো চিঠিতে দেখেছি মায়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজ খবর নিতেন। ফলে যে রকম স্বাভাবিক বুদ্ধিমতী ছিলেন তাতে স্কুল কলেজে না গিয়েও যে নিজেকে রীতিমত শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। গল্প পড়বার নেশা তাঁর ছিল বলে' ইংরিজী পড়া তাঁর সহজে এগিয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর সেই লোভ বোধ হয় আমি উত্তরাধিকারে লাভ করেছি! আমার পিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবী যে বাঙ্গালী লেখিকাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও খুব অল্প বয়সেই নানা বিষয়ে বই ছাপিয়ে তৎকালীন সমাজকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস এখন সকলেই জানে। আমার বড় পিসিমা ৺সৌদামিনী দেবীও ছিলেন বেথুন স্কুলের অন্যতম প্রথম ছাত্রী। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে বাড়ীতে সংস্কৃত পাঠেরও আব-হাওয়া ছিল। আর বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের ধারাবাহিক খণ্ড প্রথম পড়বার জন্যে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত শুনেছি।

সেকালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা ও লেখা হয়েছে; তবে যে আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি, সে কেবল নিজের ছাত্রীজীবনের বর্ণনা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে তার পশ্চাৎপট বোঝাবার উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে যদি দায়ে পড়ে' নিজের পারিবারিক কথার উল্লেখ বা নিজের পূর্ব্বোল্লিখিত কথার পুনরুল্লেখ করতে বাধ্য হই ত সে যুগল ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

এস্থলে আর একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। আমার বাবা বিলেত যাবার দরুণ ও সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত হবার দরুণ জোড়াসাঁকোর পরিবারের মধ্যেও আমরা একটু স্বতন্ত্রভাবে মানুষ হয়েছিলুম। অর্থাৎ পৈতৃক বসত-বাটী ছেড়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলে ভাড়াবাড়ীতে থাকতুম, লোরেটো ইস্কুলে যেতুম, ইত্যাদি। খুব ছেলেবেলায় কিছুকাল মায়ের সঙ্গে বিলেত থাকার দরুণ ইংরিজী ভাষা শিখতে কষ্ট পেতে হয় নি। পরে লোরেটোতে যাওয়ার দরুণ ফরাসী ভাষাটা সহজেই 'দ্বিতীয় ভাষার' স্থান অধিকার করেছিল। মাতৃভাষা মাতৃদেবীর মুখে মুখে শিখেছিলুম—যেমন হওয়া উচিত। কেবল আমার মনে হয় ইস্কুলে না শেখার দরুণ যেন তার ভিতটা বরাবরই কাঁচা রয়ে গেছে। যতই বল না কেন, ইস্কুলে যা' শেখা যায় তার গোড়াপত্তনটা পাকা হয়। তবে আমাদের বাড়ীর বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চার গুণে ও বিয়ের পরে (সদ্‌গুণে?) সে দোষটা কতকটা খালন হয়ে গিয়েছে আশা করি।

ভিক্টোরীয় যুগের কন্‌ভেন্টের শিক্ষায় কতকগুলি ত্রুটি ছিল। তার মধ্যে প্রধান একটা এই যে, অঙ্কের দিকটা ছিল বড় 'দুর্ব্বল'। তখনকার দিনে য়ুরোপে পাঁচটি ভাষা, গানবাজনা, চিত্রবিদ্যা, সৌখীন সেলাই, এইগুলি মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় বলে বিবেচিত হত; যাকে বলা হত accomplishments। তাই ক্যাথলিক nunরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আসতেন, সেই শিক্ষাই দান করতে পারতেন। পরে লোরেটো যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁচলে বাঁধা বা affiliated হল, তখন শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার বিষয় সব বদলে আধুনিক ছাঁচে ঢালাই হল। কিন্তু সে সব আমাদের কালের পরে। আমরা বেচারীরা সেই পুরাকালের তার হীনতার কলঙ্কের ভাগী হয়েই রইলুম—যখন আমাদের শিক্ষয়িত্রী নিজে অঙ্ক শিখে তবে আমাদের শেখাতে পারতেন। সেই জন্যে ঐ বিষয়টি আমার কখনোই মাথায় ঢুকল না; এবং তার জন্যেই I. A. (তখনকার F. A.) তে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হই বলে আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যৎ জীবনে তার জন্য কোন ক্ষতি হয়েছে বলে বোধ হয় না। কারণ আমার ৺শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁর এক বিলাতী ডিগ্রীধারী বউয়ের বিষয় যেমন লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন—"আমার অমুক বউমা এত লেখাপড়া শিখে শেষে সেই ধোবার খাতাই ত লিখছে!" তেমনি আমিও যেটুকু অঙ্ক শিখেছিলুম, তা'তে আমার সংসারের হিসেব লেখার কাজ এ পর্য্যন্ত চলে' যাচ্ছে। তবে অঙ্কের ভিতটা ভালভাবে পত্তন হলে হয়ত মাথাটা আর একটু পরিষ্কার হত;—কে জানে? সে যাহোক একথা আমি বিশ্বাস করি যে কারো কারো ভাষা প্রভৃতির দিকে, আবার কারো কারো অঙ্ক প্রভৃতির দিকে প্রথম থেকেই স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। সেই হিসেবে ম্যাট্রিকের পর থেকে যে science ও arts-এর দুই বিভিন্ন পথের যেটি ইচ্ছে বেছে নিতে দেওয়া হয়, সেটা খুব সঙ্গত কাজ বলে মনে হয়। যখন শুনি কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, দিয়েছে, সাশ্চর্য্য সম্ভ্রমে আমার মাথা আপনি নুয়ে পড়ে।

লোরেটো ইস্কুলে আর একটা জিনিষ হত, সেটা তার বিশেষত্ব কিনা, তা' অন্য স্কুলের অভিজ্ঞতা না থাকায় ঠিক বলতে পারলুম না। সেটি হচ্ছে কোন কোন মেয়ের কোন কোন nunএর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত, অন্য ক্ষেত্রে হলে যাকে বলা যেতে পারে প্রেমে পড়া। আমাদের বাড়ীর ৩।৪টি মেয়ের সে দোষ বা গুণ ছিল। একটি বোনের প্রিয়পাত্রী Sister Columbaকে 'কলম্বা নেবু' বলে তার ভাইরা তাকে ক্ষেপাতো মনে পড়ে। আমার প্রিয়াকে দেখবার জন্য আমাদের কোন প্রশ্রয়দাতা গুরুজনকে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম, তার বিবরণ এখনো পুরণো ভারতী পত্রিকার পাতা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে। কিন্তু "হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব হৃদয়!" কোথায় গেল সেই দেখবার আগ্রহে দুরু দুরু বুক, সেই বিদায় কালে টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়া; অন্ততঃ আমার না হোক্, আমার এক বোনের পড়তে দেখছি।—তবেই হ'ল! মেয়েদের মধ্যেও এ রকম পরস্পরের প্রতি পক্ষপাত ছিল। কিন্তু সে বোধ হয় সব দেশে সবকালেই হয়ে থাকে। এবং সে শুধু ভবিষ্যৎ জীবনের পাঠের ভূমিকা মাত্র,—কেবল একটু যা ব্যাকরণের প্রভেদ!

লোরেটো তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেনি, আগেই বলেছি; তাই টেনেটুনে আমাদের ক'জনকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে আমি বাড়ীতেই পড়েছি। আমার অন্য সহপাঠী কে কি করেছিল ঠিক জানিনে; যদিও বহুকাল পরে কদাচ কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে। লোরেটোয় আর্ম্মানী মেয়ে অনেক যেত, আর ফিরিঙ্গী; খাঁটি ইংরেজ ও খাঁটি বাঙ্গালী কম। তাই

আমাদের একটু মান্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তারপরে এত বেশি বাঙ্গালী মেয়ে ভর্ত্তি হতে লাগল যে, শুনতে পাই নিয়ম করে কমাতে হল; কারণ আসলে লোরেটো ইস্কুল এবং St. Xavier's সম্প্রদায় বিশেষের জন্যই প্রধানতঃ স্থাপিত। আমাদের "স্বাধীনতাহীনতা"র একটা অঙ্গই এই যে, নিজেদের ভাল ইস্কুলের অভাবে (বা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের অভাবে?) সেই জায়গায়ই ঢুকতে চাই যেখানে আমাদের নিতে চায় না।

তারপর আর কি?—বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন মাষ্টারের কাছে পড়ে' ক্রমে I. A. ও পরে B. A. দিই, এবং পাশও হই। সেই পূর্ব্ব ফরাসী শিক্ষার জোরে ও জেরে বি, এ, তে ফরাসীই নিই; এবং মনে আছে সেটা La Martiniere-এর কর্ত্রী Miss Adams-এর কাছে গিয়ে পড়ি। প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েরের 'হঠাৎ নবাব' পড়তে পড়তে হাসি চেপে রাখতে পারতুম না, সে কথাও মনে পড়ে;—আশ্চর্য্য এই পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসর পরে! সেদিন 'দেশ' পত্রিকার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের বিবরণের মধ্যে আমার নাম ও ছবি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম। সেই আমি যে এই আমি তা' মনেই হয় না;—এত দূরে সরে গেছি যে যেন আর একজন লোক হয়ে পড়েছি। ফরাসী নেওয়াতে যে বিশেষ কোন অপূর্ব্বত্ব ছিল, তাও কখনো ভাবিনি। এতদিন পরে শুনছি যে আমি নাকি 'পেরথম্' বাঙ্গালী মেয়ে (যেমন আমার জ্যাঠাইমা বলতেন!) যে এ কাজ করে। মায়ের এক মেয়ে হবার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। কারণ যত সাধ একজনের উপর দিয়েই মেটাতে হয়। সেই হিসেবে তিনি আমাকে ইটালিয়ান ভাষাও শেখাবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু কি ভাগ্যি সূত্রপাতেই দাঁড়ি পড়ে' গেল, কেন ঠিক মনে নেই। আমার এক কাকারও (যে দেবর মা'দের পড়াতেন) শুনেছি এমন-শিক্ষা বাই ছিল যে নিজের বড় মেয়েকে fencing পর্য্যন্ত শেখাতে ছাড়ননি; যদিও পরবর্ত্তী জীবনে তা কি কাজে লাগতে পারে বলা শক্ত,—এক কথার মারপ্যাচ খেলায় ছাড়া! সংস্কৃত কখনো রীতিমত শিখিনি, যদিও মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাবা সংস্কৃত কাব্য এত ভালবাসতেন যে তাঁর মুখের পাঠ ও আবৃত্তি শুনে শুনে দেবভাষার ব্যাকরণ না হোক দিব্যধ্বনির সঙ্গে কতক পরিচয় লাভ হয়েছে; আর সে কি মস্ত লাভ!

আমি বুঝতে পারছি যে, আমাদের কালের শিক্ষা-চিত্র আঁকতে বসে কেবলমাত্র নিজের জীবন-চিত্রের উপরেই দাগ বুলিয়েছি। তবে পূর্ব্বেই বলে' থালাস হয়েছি যে, নিজের পরিবারের বাইরের অভিজ্ঞতা আমাদের বড় একটা ছিল না। কিন্তু দু'চারটে বিষয় একাল ও সেকালের সাধারণ প্রভেদ স্বতঃই ধরা পড়ে। এক হচ্ছে, সেকালে বিলেত ফেরৎ সমাজে প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ধাক্কায় ও মোহে যেরকম লেখাপড়া, গানবাজনা, বেশভূষা, বলাকওয়া, চলাফেরা সব বিষয়েই ইংরেজের নকলটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল, এখন তার তুলনায় স্বদেশী চালটা কতক ফিরে এসেছে। বরং বাঙ্গালা না জানাটাই ছেলেমেয়েদের পক্ষে লজ্জার বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যায় ঢের বেশি মেয়ে ডিগ্রী নিয়ে বেরুচ্ছে বলাই বাহুল্য। অথচ আবার তারই মধ্যে অধিকাংশই ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না না জানে, তাও নয়;—যার আগে অভাব ছিল। তারপর মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার দিকে আগের চেয়ে ঢের বেশি ঝোঁক পড়েছে; নাচের ত কথাই নেই, এখন সে বিদ্যাকে অনেকটা জাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। বাড়ীর বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের গতিবিধি ঢের বেশি অবাধ হয়েছে এবং দলবদ্ধভাবে তারা অনেকে সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও নেমেছে। স্বদেশী যুগের প্রভাবে মেয়েদের জীবনে একালে যে প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় ঘটেছে তার উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাদের উন্নতির বাধাবিঘ্ন ক্রমে সরে যাচ্ছে, এবং উত্তরোত্তর তারা পুরুষের সমকক্ষতা লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, শরীর তাদের আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং সে দোষ সংশোধন করতে না পারলে তারা কোন স্থায়ী উন্নতিই লাভ করতে পারবে না।

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ভালমন্দের বিচার আমার 'নারীর উক্তি' বইখানায় ইতিপূর্ব্বে করেছি। আদর্শ হচ্ছে অবশ্য সেকালের গুণগুলি বর্জ্জন না করে' এ কালের সমাজের উপযুক্ত করে মেয়েদের গড়ে তোলা। কিন্তু সেটা বলিতে যত সহজ, করিতে তা' নয়। তবু এই দুরূহ কাজেই আধুনিক বাপমাদের ব্রতী হতে হবে। এইখানেই রোমন্থনে ইতি।

মেয়েদের কাগজ

শ্রীশান্তা দেবী

আজকাল বাংলাদেশ মাসিকপত্রে প্লাবিত; পুরাতন কাগজ ত আছেই এই যুদ্ধের বাজারেও নূতন নূতন কাগজ বাহির হইতেছে। তাহার মধ্যে মেয়েদের কাগজও আছে। কিন্তু পুরাকালে মেয়েদের কাগজে মেয়েদের উন্নতির জন্য যত চেষ্টা করা হইত, সেই তুলনায় মহিলা কর্ম্মী ও শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা অনেক কম ছিলেন। বেশীর ভাগ কাজই পুরুষ জাতিকে করিতে হইত। বামা-বোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকা পুরুষের দ্বারাই সম্পাদিত ছিল, লেখকও অনেক পুরুষ ছিলেন, অবশ্য মহিলা লেখিকা যে ছিলেন না তাহা নয়। তবে তাঁহারা বেশীর ভাগ কাঁচা ধরণের কবিতা ইত্যাদি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন।

ইহার পরে 'ভারতী'র মত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী তিনজন সুশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলার দ্বারা সম্পাদিত হয়। মহিলাদের কাগজ বলিতে যাহা বুঝায় ভারতী তাহা ছিল না। তাহা সর্ব্বসাধারণেরই কাগজ এবং বিশেষ করিয়া পুরুষদেরই রচনায় সমৃদ্ধ এবং তাঁদের কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণে উৎসৃষ্ট ছিল।

ইহার পর অন্তঃপুর, সুপ্রভাত, ভারত মহিলা, প্রভৃতি অনেক মহিলা পত্রিকা উদিত হইয়াছে ও অস্ত গিয়াছে। সকলেরই কিছু কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা স্ত্রীজাতির যেমন করিয়া করা উচিত ইহারা কেহই তেমন করিয়া করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

তারপর 'জয়শ্রী' বার বার দেখা দিয়া বার বার অন্তর্হিত হইয়াছে। মেয়েদের উন্নতি-চেষ্টায় জয়শ্রীর কিছু দান আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া এক টানা একটা কাজে অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া না থাকিতে পারিলে, কোনো কাজের ফল আশানুরূপ ত হয়ই না তাহার চেয়ে অনেক কমই হয়। এই কারণে মহিলাদের হিতকাঙ্ক্ষিনী মহিলারা যদি পত্রিকার সাহায্যে মহিলাদের হিতসাধন করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত সর্ব্বাগ্রে এমন একটি দল গঠন করা যাঁহারা সকলেই লিখিতে পারেন এবং যাঁহাদের সকলেরই নারীজগতের হিতাহিত সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান আছে। সর্ব্বদেশের নারীজাতির সামাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ও কৃতিত্বের ইতিহাস ইহাদের জানা থাকা দরকার। বাহিরের কেহ লেখা দিক বা না দিক, তাঁহারা নিজেরাই যদি প্রতি মাসে সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনায় অল্প-বিস্তর আনন্দ পরিবেশনে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সফলতার পথে কোনও বাধা সহজে আসিতে পারে না এবং তাহা হইলেই পত্রিকার আদর্শ উচ্চ ও খাঁটি রাখিতে পারা যায়। সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর করিলে পরের রুচি ও আদর্শের অধীনে ত যাইতে হয়ই, যথাকালে তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে পত্রিকা প্রকাশে ও প্রচারে বহু বাধা আসিয়া পড়ে।

৫২।৫৩ বৎসর আগে 'দাসাশ্রম' নামক আতুরাশ্রমের 'দাসী' নামে একটি পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, অবসর সময়ে অন্যান্য কাজের সঙ্গে 'দাসী'র সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার লেখক গোষ্ঠি প্রথম দিকে বড় ছিল না। তাঁহার দুই একজন বন্ধু কবিতা লিখিবার ভার লইয়াছিলেন। আর বাকি কাজের ভার ছিল তাঁহার নিজের উপর। কোন কোন মাসের শেষে দেখা যাইত বেশী লেখকের সাহায্য মিলে নাই, কাগজের তিন চতুর্থাংশ সম্পাদকের নিজের রচনাতেই ভরতি হইয়াছে, বাকি এক-চতুর্থাংশ তাঁহার অন্য এক বন্ধু ৺ইন্দুভূষণ রায় লিখিয়াছেন। দুই এক মাস এমনও গিয়াছে যে কবিতা লিখিবার লোক মিলে নাই, বন্ধুবর ইন্দুভূষণ রায়ও তখনও কাজে যোগ দেন নাই নয়ত বাহিরে অন্য কাজে চলিয়া গিয়াছেন, সম্পাদককেই একলাই সব কাজ চালাইতে হইবে। তখন তিনি কবিতা,

প্রবন্ধ, সবই এক হাতে নিজে লিখিয়া কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে এই কাগজ এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকরাই তাহার লেখক হইলেন।

আমরা যদি এই রকম ভাবে তৈরী থাকিতে পারি, তাহা হইলে ঠিক যে যে জিনিষ আমরা হিতকর ও আনন্দকর বলিয়া মনে করিব এবং তাহার যে জাতীয় আদর্শের নীচে আমরা নামিতে চাহিব না, সেই আদর্শমত সেই জাতীয় জিনিষ আমরা পাঠক পাঠিকাকে পরিবেশন করিতে সহজে পারিব। রোগের চিকিৎসার সময় যেমন যেদিন কুইনিন পাইলাম কুইনিন দিলাম, যেদিন ক্যাষ্টর অয়েল পাইলাম ক্যাষ্টর অয়েল দিলাম, বলিলে নির্ব্বিচারে যে কোন রোগ সারানো যায় না, তেমনি সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় কোনও ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলেও যখন তাহার যে কোন অঙ্গের চিকিৎসককে সামনে পাইলাম তখন তাহার সাহায্য লইলেই চলে না। পিছনে একজন কি দুই চারিজন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদের থাকা প্রয়োজন যাঁহারা আমাদের নির্ব্বাচিত ব্যাধিগুলির দিকে চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন এবং তাহাতেও যদি না হয় ত স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ্যা লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমেই যেন কমিয়া যাইতেছে। কিছুকাল আগে আমাদের দেশে স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, কুমুদিনী বসু প্রভৃতি এমন অনেক মহিলা বাংলা কাগজে লিখিতেন যাঁহাদের অনেকেরই নাম বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়াছিল। তাহার পরের যুগেও এমন দুই একজন মহিলা বাংলা কাগজে লিখিতেন যাঁহাদের নাম বাংলার বাহিরে এবং ভারতের বাহিরেও অল্প স্বল্প লোকে জানে। কিন্তু এই অতি আধুনিক যুগে বাংলা লেখিকা সমাজে যেন একটু দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুই চারিজন গল্প কবিতা লেখেন কিন্তু তেমন খ্যাতি অর্জ্জন করিতে কেহ পারেন নাই। আবার কেহ যদি বা দুই চারিটা ভাল প্রবন্ধ কখন লেখেন ত সেইখানেই দাঁড়ি টানিয়া দেন। আর নূতন কিছু লিখিবার উৎসাহ দেখা যায় না।

আগেকার কালে বাংলায় এম্-এ পরীক্ষা ছিল না, অন্য বিষয়েও ২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় মেয়ে এম, এ পড়িতেন। ২৪ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজীতে এম্, এ পড়িতে গিয়া দেখিলাম ক্লাসে দুইটি মাত্র মেয়ে। এখন এই কয় বৎসরে বাংলায় ও অন্য বিষয়ে কত মহিলা এম্, এ, ই হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লেখনী ধরেন? এই যে লিখিবার অনিচ্ছা ও অপারগতা অথচ পড়িবার আগ্রহ এই দুইটার মধ্যে স্বাভাবিক মিল নাই।

মহিলাদের উচিত ইহার কারণ অনুসন্ধান করা এবং ইহার প্রতিরোধ করা। সরস্বতীর কৃপা- যাঁহারা পাইলেন তাঁহারাই যদি বোবা হইয়া থাকেন, তবে কথা বলিবে কে? অবশ্য রাজনৈতিক সভায় ও অন্যান্য সভায় কথা চলাও বলা। কিন্তু স্থায়ী বাণী লেখনীর সাহায্যেই ফোটে, বক্তৃতামঞ্চে নয়।

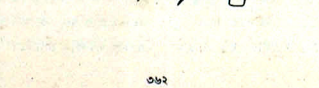

উপার্জ্জন ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী

শ্রীসুপ্রীতি সান্যাল

ভারতের নারী জাগরণের অন্যতম অভিব্যক্তি নারীর উপার্জ্জন ক্ষেত্রে প্রবেশ। এতদিন গৃহকোণে নারী ব্যাপৃত ছিল একান্ত চেষ্টায় তার স্বামী পুত্র পরিজনের সেবায় নিরতা। এই ব্যবস্থায় অবশ্য সে পরিতুষ্ট ছিল কিনা সেকথা সঠিক বলা না চললেও গতানুগতিকতার চাপ পড়ে সমাজের অনুশাসনকে মেনে নিয়েই চলছিল তার জীবনযাত্রা। নিজেদের স্বল্প পরিসর গৃহের গণ্ডি ছাড়াও বাইরের জগতে সমস্ত মানুষের মধ্যে তার যেস্থান আছে কর্ত্তব্য আছে এ কথা সে সংস্কারের অন্ধ আবেষ্টনীতে ভুলেই ছিল। হঠাৎ একদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের অনুকরণে এই আত্মবিস্মৃতির মূলে পড়ল আঘাত। নারী ফিরে চাইল তার নিজের দিকে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কত পশ্চাতে তার স্থান অথচ ভারতের অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যায় একদিন নারী শিক্ষায় দীক্ষায় অধিকারে কত সমৃদ্ধ ছিল। নারীর নিজের সত্যিকারের পরিচয় তখন আত্মপ্রকাশ করল তারই প্রতিধ্বনি সেদিন শোনা গেল—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার।"

কিন্তু তার অগ্রগতির পথে আজ অসুবিধা অনেক—যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে তেমনই উপার্জ্জন ক্ষেত্রে। অবশ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন অপেক্ষাকৃত সুবিধার সৃষ্টি হোয়েছে কিন্তু উপার্জ্জন ক্ষেত্রে এখনও উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ নিয়োগকারী ও নিযুক্ত উভয়েই অনভ্যস্ত বলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে সংসার বলে যে unit আছে তাতে মেয়েদের উপর পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যাবতীয় ভার ন্যস্ত থাকে। পুরুষ শুধু উপার্জ্জন করেই খালাস। গৃহের শৃঙ্খলারক্ষা ও সংসার শান্তি এবং সন্তান সন্ততিদের লালন পালন ও শিক্ষা সমস্তই নির্ভর করে মেয়েদের উপর অবশ্য সাধ্যানুসারে সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিবিধান কল্পে মেয়েদের অর্থার্জ্জন করা উচিত। কারণ তার ফলে উন্নততর জীবন যাত্রা প্রণালীও প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু মেয়েদের উপর এই দ্বিবিধ কর্ম্মভার পড়লে প্রথমতঃ অত্যধিক কাজের চাপ পড়ে' তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা কঠিন হয়। দ্বিতীয়তঃ দুটি কর্ত্তব্যের কোনটিই সম্পূর্ণ সুষ্ঠু রূপে সম্পাদিত হয় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কর্ম্মক্লান্ত নারীকে গৃহে এসে পরিজনবর্গ স্বামী ও সন্তানের সেবায় পুনরায় আত্ম নিয়োগ করতে হয় তার ক্লান্তি অপনোদনের বা তার বিশ্রামের সময় কোথায়? অথচ এই কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করাও তার একান্ত প্রয়োজন এবং একাজ গুলি অবহেলিত হোলে তারই ক্ষতি। কারণ তার সন্তান উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগের অভাবে স্বাস্থ্যহীন ও অশিক্ষিত থেকে যাবে। এবং স্বামীও সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর স্ত্রীর সেবা ও সাহচর্য্য না পেলে মানসিক ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। আমাদের দেশের যেসমস্ত পরিবারের মেয়েরা অর্থান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে তাদের সংসারের আর্থিক অবস্থার প্রায়ই অস্বাচ্ছন্দ্য বলেই তাদের এই প্রচেষ্টায় নিরত হোতে হয়। কাজেই উপরোক্ত কাজের জন্য শিক্ষয়িত্রী বা গভর্ণেস ও দাসদাসী রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যাদের শিশু সন্তান আছে তাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় অশিক্ষিত দাসীর হাতে সন্তান ফেলে রেখে যাওয়া মানেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলা শিশু, যদি শৈশবে অর্থাৎ অন্ততঃ বৎসর কাল মাতৃস্তন্য পায় তার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ থাকেনা। সাংসারিকবিধি ব্যবস্থায়ও গৃহিনীর নিপুণ হাতে যে শৃঙ্খলা ও economy সম্পাদিত হয় তা দাসদাসীর দ্বারা সম্ভব হয় না। কাজেই বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে সুদীর্ঘ ক্ষণ বাইরের কাজে আবদ্ধ থাকলে সংসারে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা কঠিন সন্দেহ নেই। মেয়েদের পক্ষে শোভন ও সুবিধাজনক হোতে পারে part time work অথবা ছোট খাট শিল্পের অনুশীলন যা বাড়ীতে

বসে গৃহকর্ম্মের অবসর সময়ে করা সম্ভব হোতে পারে। পাশ্চাত্যে যে সমস্ত দেশে নারীকে উপার্জ্জনের নানা সুবিধা দেওয়া হোয়েছে সে সমস্ত দেশেরই পারিবারিক বন্ধনে যথেষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং মেয়েদেরও দ্বিবিধ পরিশ্রমে অর্থাৎ ঘরে বাইরে সমান কাজে কর্ম্মক্লান্ত করে তোলে না। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্তর জন্য নিজেদের সংসারে অসুবিধা বোধ করলে তারা অতি সহজে হোটেলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং এতে তারা অনভ্যস্তও নয় এবং শিশুদের পালনের জন্য নার্সারী ও ডরমিটরীর ব্যবস্থাও আছে অর্থাৎ মেয়েদের উপার্জ্জন করার যেমন সুযোগ দেওয়া হয় সে সুযোগকে ব্যবহার করার সুবিধাও তাদের নেহাৎ কম নয়। আমাদের দেশেও ব্যাপক ভাবে নারীসমাজকে যদি উপার্জ্জন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও হওয়া প্রয়োজন; তাই নার্সারী বা ডরমিটরী ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া দরকার। এতে শিশুরা অবহেলিত বা অযত্ন পালিত হোয়ে স্বাস্থ্যহীন ও শিক্ষাবিহান হোয়ে জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার সুযোগ পাবে না।

এছাড়া আমাদের গরীব দেশে যেখানে পুঁজীর অভাবে প্রচুর আয়োজন সাপেক্ষ ব্যবসায় সম্ভব নয় যেখানে Ruralisation of industries অর্থাৎ শিল্পকে পল্লীমুখীন করার প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হোতে পারে। এবং এই ব্যবস্থায় কারখানা জীবনের আনুষঙ্গিক দোষগুলিকেও অনেক পরিমাণে এড়ানো যাবে। বাড়ীতে বসে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্প পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং সহজ ধরণের কাজগুলি মেয়েরা ঘরে বসে গৃহকর্ম্মের অবসর সময়ে করতে পারবে। যেমন ধরা যাক সাইকেল তৈয়ার কারখানার বহুরকমের কাজ আছে। নিয়োগকারী যদি বড় কারখানা করে সেখানেই প্রচুর শ্রমিক না খাটিয়ে সমস্ত কাজগুলি অর্থাৎ সাইকেলের বিভিন্ন অংশ-ঐ কারখানাতেই না তৈয়ারী করে গ্রামে গ্রামে সাধারণ লোকেদের মধ্যে ছোট ছোট যন্ত্রে ঐ অংশগুলির প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেন তাহলে ঘরে বসেই ঐ part বা অংশগুলি বাড়ীর মেয়েরাই তৈরী করতে পারে এবং সপ্তাহান্তে নিয়োগকারী সেগুলি সংগ্রহ করে assembly plantএ এনে সেগুলি সংযোজিত করে সাইকেলগুলি অনায়াসে তৈরী করতে পারেন। এখানে শ্রমবিভাগ হবে শারীরিক শ্রমসাপেক্ষতার পরিমাণ হিসাবে অর্থাৎ কঠিন শ্রমসাপেক্ষ কাজগুলি ও বড় যন্ত্রে প্রস্তুতের কাজগুলি কারখানায় এনে করা হবে। এবং সহজসাধ্য কাজগুলি গ্রামে গ্রামে বিতরণ করে দেওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা ঘরে বসেই মেয়েদের পক্ষে উপার্জ্জন সম্ভব হয় এবং বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজও হয়। মেয়েরা এই ধরণে শিল্পে একবার অভ্যস্ত হোয়ে গেলে parts তৈরীর specialised machinery গুলিও পরে নিজেরাই কিনে নিতে পারবে শুধু কাঁচামাল ও মজুরী দিয়েই নিয়োগকারী প্রস্তুত জিনিষ এদের কাছ থেকে পেতে পারবেন।

যুদ্ধের প্রয়োজনে মেয়েদের কর্ম্মক্ষমতা ও জাতীর সংকটের দিনে জীবনযাত্রার সমস্তক্ষেত্রেই তাদের প্রয়োজনীয়তাকে এবার সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা গিয়েছে কাজেই যুদ্ধোত্তর ভারতে আর মেয়েদের অকর্ম্মণ্য করে গৃহকোণে ফেলে রাখার ইচ্ছা হয়ত ভারতবাসীর থাকবে না। নারীকে সমাজে নিজের স্থান নিজে অধিকার করে নিতে দিতে এরা আর অসম্মতি দেখাবে না বলেই মনে হয়। এ ইচ্ছাকে সফল করতে হোলে ভারতীয়দের প্রথম প্রয়োজন যুদ্ধোত্তর ভারতে জাতি গঠন পরিকল্পনায় শারীরিক গঠনও শ্রমসাপেক্ষতার প্রতি নজর রেখে নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবণ্টন করে দেওয়া, যার দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পথে নারীর উপার্জ্জন ক্ষেত্রে প্রবেশ যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

———

তাহার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল। জোহেরার আহার সম্বন্ধে কোনোই খোঁজ করিল না।

শৈশবেই জোহেরা পিতৃহীনা হয়; তার বাপের কথা তার মনেই নাই, মাকেও ভালো মনে পড়ে না। সে যে কোনো দিন পিতামাতার সন্তান ছিল, একথা ভাবিতে তাহার হাসি পায়। পিতাকে মৃত্যু কাড়িয়া নিলেন, মা স্বেচ্ছায় শিশু কন্যাকে ফেলিয়া প্রবৃত্তির বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। একজন মিশনারী মেমের কাছে সে কাজ করিত, তিনি তাহাকে স্নেহ করিতেন আর যত্ন করিয়া কিছু লেখাপড়াও শিখাইয়া ছিলেন। তিনিও বেশীদিন জোহেরাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না, লোকান্তরে তাঁহার ডাক্ পড়িল। নিরাশ্রয়া জোহেরাকে বিপত্নীক রহমৎ বিবাহ করিয়া তাহাকে মফুল হইতে কুলে লইয়া গেল।

ভোর বেলা কলের বাঁশি বাজিবার পূর্ব্বেই জোহেরা জাগিয়া উঠিল, মেয়ের কপালে হাত দিয়া দেখিয়া কলসী লইয়া জল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

(২)

রহমতের সহিত জোহেরার তুমুল কলহ বাধিয়াছে। জোহেরা স্পষ্ট ভাষায় বলিল যে ঘরে বাইরে এত খাটুনী সে পারিবে না, তাহার শক্তি নাই। রহমৎ তাহাকে খুন করিয়া ফেলিলেও সে পারিবে না।

দন্তহীন মুখখানাকে বিকৃত করিয়া রহমৎ বলে 'রাজকন্যে আর কি! খাটে ব'সে পা' দুলিয়ে খাবেন! তবে কেন সর্দ্দারকে অপমান করেছিস্? সে তো কত কিছু দিতে চায় কেন, তার সঙ্গে হেসে দুটো কথা কইলে, তার কথামত একটু চল্‌লে কি মান খুয়ে যায়? কি সতীপণা রে!'

জোহেরা আর শুনিতে পারেনা, তার দুই কাণ ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে। সে দুই কানে আঙ্গুল গুঁজিয়া উপুর হইয়া পড়ে। রহমৎ আপন মনে বকিতে থাকে। 'কি একগুঁয়ে মেয়ে বাবা! বাপের জন্মে এমন দেখিনি। পেট ভ'রে খাবি, খাটের উপরে ব'সে থাক্‌বি, তোর রূপ আছে, যৌবন আছে, তোর আবার ভাবনা কিসের?'

রহমৎ কিছুতেই জোহেরাকে ক্ষমা করিতে পারেনা, সকল সুখ ঐশ্বর্য্যকে যে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিবে সে কিসের জন্য?

সেদিন জোহেরার বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। চোরের মত ঘরে ঢুকিয়া দেখিল চীৎ হইয়া শুইয়া রহমৎ বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতেছে।

জোহেরার মনে খুসির বন্যা বহিতেছিল। সে স্বামীর শয্যার কাছে বসিয়া পড়িয়া গায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল 'শুয়ে আছো কেন? অসুখ করেনিতো?'

আসতে দেরি হইয়াছে বলিয়া রহমৎ অশ্রাব্য কটুক্তি করিয়া উঠিল। নিমেষে জোহেরার হাসিমুখ কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কোমল স্বরে বলিল 'সত্যি, দেরি হ'য়ে গেছে আর ফিরতে। রান্না হ'তেও দেরি হবে, ক্ষিদেয় তোমার বড় কষ্ট হবে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "এই যে সারাদিন খেটে এসে দুটি খেতে পাওনা, এই যে কত উৎপীড়ন আমরা সহ্য করি, কিন্তু কেন করি? এর প্রতীকার তো আমাদের নিজেদেরই হাতে।'

নিমেষে রহমতের নেশা দূর হইয়া গেল। জ্যা মুক্ত ধনুকের মত উঠিয়া বসিয়া সে বলিল 'কি বল্‌লি? আবার বল্‌তো?'

রহমতের কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া জোহেরা সরিয়া বসিল, কথা বলিল না।

'তাই বুঝি বিবিজানের আসতে দেরি হ'য়েছে? কল্‌কাতায় বাবুরা এসে সভা ক'রেছে, সেইখানে যাওয়া হয়েছিল বুঝি? তাই মুখ দিয়ে খই ফুটছে?'

সাহস করিয়া জোহেরা বলিল 'গেলে কি দোষ হয়? আমাদের ভালোর জন্যই—'

'স্বয়ং পীর পয়গম্বর আর কি!' রহমৎ ভ্যাংচাইয়া উঠিল! 'সেখানে গেলি তুই কোন্ সাহসে? ক'ল্‌কাতার বাবুরা যাদু জানে, এসেছে তোদের মত বোকা মেয়েদের ভোলাতে! ফের্ যদি যাবি সেখানে, লাঠি দিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

পরদিনও জোহেরার ফিরতে দেরি হইল। রহমৎ ক্ষমা করিল না, বেতের ঘায়ে পিঠ দিয়া ঝর্ ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সব সহিয়া জোহেরা মিনতি করিয়া স্বামীকে বলিল।

Numbering Error

ওদের কথা শুন্‌লেই আমাদের সব দুঃখু দূর হ'য়ে যাবে। এসো সকলে একমত হ'য়ে—'

রহমৎ টিটকারী করিয়া উঠিল 'সেই গোরা ছোড়াটাকে তোর দেখি খুব মনে ধ'রেছে! এ বুড়োকে বুঝি আর ভালো লাগছে না। ছোড়ার বরাৎ ভালে।'

জোহেরার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; সে চোখের দিকে চাহিয়াও রহমৎ দমিল না, 'বলি, সর্দ্দার তবে কি দোষ করেছে তার কথা একটি শুনে চ'ল্‌লেই কত খাট পালং—'বলিয়াই মৃদু মৃদু মাথা নাড়িতে লাগিল।

জোহেরা ঝাঁজিয়া উঠিল 'লজ্জা করেনা তোমার স্ত্রীকে এসব কথা ব'ল্‌তে। কি ভাবে নিজের প্রাপ্য দাবি কর্‌তে হবে, যিনি এই সব সদুপদেশ দিচ্ছেন তাঁর কথা শুন্‌তে গেলে পিঠের চামড়া ছিড়ে যাবে; আর আর—'

সে আর বলিতে পারিল না; দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

(৩)

জোহেরা প্রায় চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সে কাজে যায় নাই। অসহ্য গরম, বারাণ্ডায় একখানা ছেড়া মাদুর পাতিয়া শুইয়া সে হাতপাখা নাড়িতেছিল। মেয়েটী কাছে বসিয়া পুতুল খেলিতেছিল।

অপূর্ব্ব পুলকে জোহেরার মন আচ্ছন্ন হইয়া রড়িয়াছিল। তাহাদের সঙ্ঘ বেশ ভালোভবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আর সে সঙ্ঘের সেক্রেটারী হওয়ার জন্য কোকনদ তাহাকেই অনুরোধ করিয়াছে! ভোটেও সে জিতিয়াছে। তাহার সমস্ত শ্রম, সমস্ত লাঞ্ছনা সার্থক হইয়াছে। জোহেরা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা চমকিয়া জাগিল, উঠানে দাঁড়াইয়া কোকনদ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে।

জোহেরা উঠিয়া বসিয়া গায়ে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল, 'আজ আমার কি ভাগ্যি!'—মেয়েকে বলিল, 'যা তো মা, চট্ করে' মোড়াটা এনে দেতো।'

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া কোকনদ বলিল, 'ভেবেছিলাম তুমি কাজে চলে গেছ।'

জোহেরা বলিল, 'শরীরটা বড় খারাপ ব'লে যেতে পারিনি কাজে।'

মোড়ার উপর বসিয়া কোকনদ বলিল, 'এক গ্লাস জল দাও জোহেরা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

গ্লাস হাতে নিয়া জোহেরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার ছোয়া জল খাবেন?'

কোকনদ বলিল, 'না খাবার কোনো কারণ থাক্‌লে বল।'

'সে কি আপনি জানেন না?'

'জানলেও মনে পড়ছে না তো!'

'আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ, আমি মুসলমান।'

'ও, এই কথা, তা যে নদী থেকে তুমি জল আনো, সেই নদী থেকে আমিও তো আন্‌ব, জলের কোনো তফাৎ তো তাতে হবে না! জল জলই থাকবে।'

জোহেরা কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দিল। জল পান করিয়া কোকনদ বলিল, 'তোমার ছোয়া ব'লে জলটাতো খারাপ হয়নি, বরং বেশ ভাল, বেশ ঠাণ্ডা খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা হ'ল।' জোহেরা নতমুখে একটু হাসিল।

'তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখছি, সন্ধ্যেয় কাজ কর্‌তে পারবে তো জোহেরা?

জোহেরার উৎসাহের সীমা নাই, 'খুব পারবো বাবু! আর সেইজন্যই আজ কাজে যাইনি। এই গরমে সারা দিন খেটে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে, বিকেলে আর কিছু করবার শক্তি থাকে না।'

'কিন্তু তোমার বেতন কাটা যাবে তো।'

'হ্যাঁ, তা' যাবে। আমাদের তো লোহার শরীর, এর সুখ অসুখ হ'লেই শান্তি পেতে হবে। আর তার জন্য ঘরেও নিগ্রহ সইতে হবেনা কম।' তারপর হাসিয়া বলিল, 'আমাদের দাবির ভিতর এই অবস্থায় পুরো মাইনেতে ছুটির দাবিওতো র'য়েছে?'

'নিশ্চয়!—আশা করি সব দাবি মঞ্জুর করিয়ে নিতে পার্‌বে। কিন্তু নিগ্রহ সহ্য কর কেন? পিপড়েও তো আত্মরক্ষার জন্য দংশন করে।'

'আমার অবস্থা আপনি বুঝ্‌বেন না বাবু, সে কথা থাক্।' নিশ্বাস ফেলিয়া কোকনদ বলিল, 'সভা কখন হবে?'

'সন্ধ্যা সাতটায়'

'কে কে বলবে?'

'সাতকড়ি, সত্যবালা, কালিমুদ্দী, জোসেফ্, আর আমি।'

'কি বল্‌তে কি হবে সব মনে আছে?'

'আছে।'

'মনে রেখো জোহেরা তোমার স্বামী তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রছে। সে-ও একটা দল পাকাচ্ছে। আর যত ফন্দীবাজ কুচক্রী সব সে দলেই প'ড়েছে।'

'সব জানি বাবু' অধোমুখে জোহেরা বলিল।

'তোমার স্বামীকে যদি তোমাদের পক্ষে আন্‌তে পার তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আর কেউ থাক্‌বে না। পারবেনা তার মনের পরিবর্ত্তন ক'রতে?'

স্বামীর মূর্ত্তি মনে পড়িয়া জোহেরা শিহরিয়া উঠিল। কোকনদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবই বুঝিল সুতরাং সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিল, 'বড় একটা জরুরী কাজে আমি আজই একটু অন্যত্র যাচ্ছি জোহেরা! আমার অসম্পূর্ণ কাজের ভার তোমাকে দিয়ে যাব।'

'আমার শক্তি কতটুকু যে আপনার পরিত্যক্ত কাজের ভার নিতে পারি।'

'তোমার চেয়ে যোগ্য মেয়ে এ বস্তীতে নেই জোহেরা। তুমি তোমাদের সঙ্ঘকে শক্তিমান ক'রে তোল। তারপর যখন ধর্ম্মঘট আরম্ভ হবে, তখন আমি আস্‌ব।'

জোহেরা কোকনদের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া নিল।

(৪)

প্রখর রৌদ্রের তাপে পৃথিবী যেন ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। দিগন্তব্যাপী মাঠ মাঝে মাঝে যে দু'একটি বৃক্ষচ্ছায়া দেখা যায় গোচারণ করিতে আসিয়া গরুর দল সেই ছায়ায় বসিয়া রোমন্থন করিতেছে।

কোকনদ পথ হাঁটিতেছে, মাথার উপরে ছাতাটা যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পাদুকা থাকা সত্ত্বেও তপ্ত বালুকায় পা' দু'খানা যেন দগ্ধ করিতেছিল।

এই অগ্নিময় মাঠে নিজের নাম শুনিয়া কোকনদ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে যে ছুটিয়া আসিতেছে, সে জোহেরা।

কাছে আসিয়া কোকনদের পায়ের কাছে পড়িয়া জোহেরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, কৃশতনু শ্রান্তিতে যেন লুটায়ে পড়িতেছে। কোল হইতে একটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া কোকনদ বলিল, 'এ কি জোহেরা!'

'একটু জল' জোহেরা কঁকাইয়া উঠিল।

কোকনদ তাহাকে ধরিয়া গাছের ছায়ায় উড়ানী পাতিয়া শোয়াইয়া দিল, অনেক খুঁজিয়া রুমাল ভিজাইয়া একটু জল লইয়া আসিয়া তাহার শুষ্ক অধর ভিজাইয়া দিল। বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া বাতাস করিতে লাগিল। জোহেরা অবসন্নভাবে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

অপরাহ্নে রোদের তেজ কমিয়া আসিল। একটু সুস্থ হইয়া জোহেরা উঠিয়া বসিল। বোধ হয় ক্ষুধাতেই শিশুটি বার বার কাঁদিতে লাগিল। কোকনদ বলিল, 'ছেলে নিয়ে ঘরে যাও জোহেরা, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। কি কথা ব'ল্‌বার জন্য এই রোদে, এই শরীরে ছুটে এসেছো? তাড়াতাড়ি ব'লে ঘরে ফিরে যাও।'

'আমার তো ঘর নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'ঘর নেই? কেন, রহমতের ঘর?'

'বাড়ী থেকে সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কল থেকে আমার চাকরী গেছে। বাড়ীর পেছনে যে বেতবন আছে, সেখানেই আমার ছেলের জন্ম হ'য়েছে।

কোকনদ কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল, 'তবু সেই ঘরেই তো তোমাকে ফিরতে হবে, তোমার মেয়েও তো সেখানে আছে।'

'থাক্ মেয়ে—ফিরব না। আপনিই তো মুখ বুজে অত্যাচার সইতে নিষেধ ক'রছেন।'

'নিষেধ করেছি সত্যি, কিন্তু পালিয়ে আসতে বলিনি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রতে বলেছি।'

কাঁদিয়া ফেলিয়া জোহেরা বলিল 'সেই শিশুকাল থেকে অত্যাচার সয়ে সয়ে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, লড়াই করবার ক্ষমতা আমার নেই কোকনদ বাবু!

'অত্যাচারে মেরুদণ্ড ভাঙে না দিদি, আরো কর্ম্মক্ষম হ'য়ে ওঠে। এত অত্যাচার স'য়েছ বলেই তুমি লড়াই ক'রবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রেছ। অত্যাচারিত না হ'লে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা সে কোথায় পাবে, দিদি।'

'কিন্তু আপনার মত মহাপুরুষের নামেও যে সব অশ্লীল কটূক্তি করে সে আমি সইতে পারিনে। আর এই দেহের উপর অত্যাচার—'

'কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে দিদি? পৃথিবীতে কি অত্যাচারীর অভাব আছে? পালিয়ে কি বাঁচবে?'

জোহেরার চোখে ভীতি ঘনাইয়া আসিল, 'তবে কি ক'রব—?'

'ঘরে ফিরে যাও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও। ভীরুর মত পালিও না—'

জোহেরার দুর্ব্বল মন যেন সজীব হইয়া উঠিল।

'কিন্তু আমার ছেলে! এই কদর্য্য আবহাওয়ায় ওকে আমি বড় হতে দেব না। তার চেয়ে বরং ওকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব'।

'পার্‌বে ছেলেকে ছেড়ে থাক্‌তে? তা' হ'লে কোনো ভাল আশ্রমে ওকে রাখবার ব্যবস্থা ক'রতে পারি।'

ম্লান হাসিয়া জোহেরা বলিল 'খোদা নিয়ে গেলেন একটিকে, তাকে ছেড়ে তো আছি! ও মানুষ হ'চ্ছে এই কথা ভেবে আমি খুব থাক্‌তে পার্‌ব। ও যেন মানুষ হয়, আপনার মত দেশের মজুর, চাষার হিতের জন্য প্রাণ দিতে পারে—'

'আমিই বুঝি তোমার কাছে আদর্শ?

'হ্যাঁ, এর বড় আশা আমার নেই। স্পর্শমণির স্পর্শে আমি সোনা হ'য়ে গেছি। ও-ও যেন তাই হয়।'

শিশুকে চুম্বন করিয়া জোহেরা কোকনদের কোলে তুলিয়া দিল। তারপর দ্রুত পথ হাঁটিতে লাগিল। একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

অর্ফিয়ুস্‌কে

শ্রীবাণী রায়

অর্ফিয়ুস্, অর্ফিয়ুস্! তোমার বীণায়
বাজাও করুণগীতি কেন বারে বার?
জাননা কি নহি আমি পুরাতন গ্রীক্,
সৌন্দর্য্য আনিনি বহি বাণী অমরার।
দেহে নাই গতি ছন্দ, কণ্ঠে নাই ভাষা,
প্রতিক্ষণ ধূলিলীন ধূলির ধরায়;
চারিপাশে ব্যথাসিন্ধু শতধা বিলাপে,
দূর হ'তে তবু বাজে বাঁশী, অর্ফিয়ুস্!
ক্ষীণদীপদীপ্ত গৃহে খুলিয়া ক্লাসিক্,
তবু শুনি, তবু শুনি বিস্মরণী সুর;
যুগান্তের অন্ধকার ঘিরেছে যাদের,
সেই গ্রীক পুরাণের আধভোলা গান।

বর্ত্তমান বিভীষিকা ধায় পিছে পিছে;
ধরণীর পঙ্কস্রোতে প্রেমের উৎপল
সে যায় ঝরে পড়ে, আবর্ত্তেতে মেশে
পুলক-বেদনাপূত অপরূপ দল।
বিনিদ্র নয়নপাতে অজ্ঞানবিলাস,
পলায়নী মনোবৃত্তি বহে অভিশাপ,
কম্পিত এ শিখা ধরে ম্লান জ্যোতিকণা,
তারো মাঝে গান গায় কবি ঈস্থিলাস্!
ধ্বংসধৃত কেশগুচ্ছ, বিড়ম্বিত প্রাণী,
তবু কেন শুনি আমি গ্রীসের সে বাণী?
কেন, কেন শুনি নিদ্রাঘোর রজনীর তীরে
স্বপ্নে আজো শুনি দূরে কাঁদে অফিয়ুস্?

সমাজের কয়েকটী নারী জীবনের চিত্র

কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

[আদরের "বোনঝি"দল—

তোমাদের মতন ভাল "শ্রোতা" আমার ভাগ্যে কোনদিন হয়নি— আর হবেও না বোধ হয়। ছোটবেলায়—শেয়ালের গল্প, রাজারাণীর গল্প যেমন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শুনতে, আজ তেমনি করেই দেশের বিপ্লবীদের জীবনী আমার অতীতের "সত্যিকারের ঘটনা" তোমরা একাগ্র চিত্তে শুন্‌তে ভালবাস।

আজ তোমাদের, বাংলা দেশের কয়েকটী মেয়ের জীবন-কাহিনী শোনাতি সাধ হয়েছে। তোমরা নতুন যুগের মেয়ে—নতুন সমাজ গড়ে তোলবার সঙ্কল্প তোমরা গ্রহণ করেছ।

নারী জীবনের যত সব গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে এই সব চিত্রের ভেতর দিয়ে তোমরা সবগুলিরই সমাধান করতে পারবে এই তোমাদের মানীমার মনে লুকান আশা।]

ক। সে অনেকদিনের কথা। কলকাতা সহরের একটি গলির তেতালা বাড়ীতে থাকতাম। নীচের একতালায় দুটি সংসার ঘর ভাগ করে নিয়ে থাকতেন। নীচের সব ঘরগুলিই বড় বেশী স্যাঁৎসেতে। সূর্য্যদেবের আলো বড় ঘরে ঢুকতে পারতনা। সারাদিন আলো জ্বেলে রাখতে হোত। এক-দিকের দুটী ঘরে থাকতেন এক বিধবা মহিলা তাঁর চার পাঁচটী পুত্র কন্যাকে নিয়ে। বড় ছেলে একজন কলেজে পড়তেন আর টিউসানী করে সংসারের অসচ্ছলতা কিছুটা কমাবার চেষ্টা করতেন। সব ছোট ছেলেটী বছর দশ হবে। মুখে তার বুদ্ধির প্রখরতা এমন ভাবে ফুটে উঠত। কত বড় বড় কবিতা আমাদের শুনিয়ে যেত—দাদার কাছে কত সুন্দর সুন্দর গান শিখেছিল তা মাঝে মাঝে শুনিয়ে যেত।

আমরা প্রায়ই বলতাম এ বড় হয়ে খুব প্রতিভাসম্পন্ন ছেলে হবে; ওর কপালে জয়টীকা আঁকা রয়েছে। কিছুদিন পরে তাকে আর ওপরে আসতে না দেখে খোঁজ নিলাম তার কি হয়েছে। তাতে জানতে পারলাম কদিন হল তার টাইফয়েডের মতন হয়েছে। দরিদ্রপীড়িত সংসারে যতখানি সম্ভব সেবা ও চিকিৎসা সবই হল। ১৪ দিনের দিন দেখলাম কজনে মিলে ছোট একটি খাটে শুইয়ে তাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল। বড় হয়ে প্রতিভাবান ছেলে হওয়া আর তার হয়ে উঠলনা। তারপর তার মা ও ভাইরা সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

—৩ মাস পরে তখনও সে ঘরগুলি খালি রয়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার হয়ে গেছে—শুনতে পেলাম নীচের সেই ঘর থেকে কার যেন গলার করুণ স্বর ভেসে আসছে—

"অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারায় তাহলে প্রাণ করে মোর হায় হায়"

কেউত ঘরে থাকেনা তবে কে গান গায়? খবর নিয়ে জানলাম সেই দশ বছরের খোকার দাদা, যিনি তাকে গান শেখাতেন তিনি প্রায় সন্ধ্যাবেলা এসে ঐ অন্ধকার ঘরে গান গেয়ে চলে যান। ছোট ভায়েয় স্মৃতি জড়ান ঐ ঘরখানি কিনা—তাই তার মায়া ভুলতে পারেননি এখনো।

পাশের ব্লকের দুটী ঘরে থাকতেন স্বামী স্ত্রী বৃদ্ধা মা ও তাঁদের দুটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।

—বৌটীর সঙ্গে কদিনে বেশ ভাব হয়ে গেল। আমাদেরি বয়সী—সেকেণ্ড ক্লাস অবধি স্কুলে পড়েছিল—তারপর বিয়ে হয়ে যায়। নিজেই রান্না করে—গৃহের সমস্ত কাজই প্রায় করে বিকেল বেলায় ছেলেমেয়েকে সাজিয়ে ছাতে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে আসতেন। সন্ধ্যা হলেই বলত, যাই সন্ধ্যাদীপ

জ্বালাতে হবে।—আমি একদিন বলেছিলাম তোমার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছেন—

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহ কাজে—
প্রভাত আসে তোমার দ্বারে—পূজার সাজি ভরি—
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ ডালা ধরি।"

একটুখানি হেসে নীচে নেবে গেল। মনে মনে ভাবতাম স্বামীর আগমনের সময় হয়েছে—তাই আমার কাছে ছলনা করে চলে যায় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

যতক্ষণ ছাতে থাকতাম সমাজের বিষয়, দেশের বিষয় অনেক আলোচনা হত। সব সময় মুখে একটা প্রসন্ন হাসি দেখতে পেতাম। একদিনের জন্য ভুলেও সংসারের কোন অভিযোগ করতে শুনিনি। ঘরগুলো কি অন্ধকার—বা ঐ টাকায় সংসার চালান কত কষ্ট ইত্যাদি একদিনের জন্যও বলতে শুনিনি। অন্যদের কাছে শুনেছিলাম অল্প মাইনের চাকরী করেন ওর স্বামী। শুধু একদিন ওদের ঘরে বসে আছি—ঘরে একটীমাত্র আম ছিল—সেটী ঠাকুমা নাতিকে দিলেন। মা বলল দিদিকে একটু তার ভাগ দিতে। ঠাকুমা বলে উঠলেন ঐ একটা আম তা আবার দিদিকে দিতে হবেনা। ছেলেটী না দিয়েই খেয়ে ফেলল—২ বছরের বড় দিদি ম্লান মুখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শাশুড়ী উঠে যাবার পর সে শুধু একটুখানি বলল "নিজের ছেলেকে ইচ্ছা মতন ভাল কিছু শেখাতে পারিনা এই বড় দুঃখ আমার"। এছাড়া কোন অভিযোগই করতে শুনিনি। আমরা ধারণা করে নিয়ে ছিলাম স্বামীকে নিয়ে ইনি বড় সুখী। আমার দিদিরা এঁকে দেখে আমায় বলতেন মনে সুখ থাকলে দারিদ্রতা যে কোন দুঃখই দিতে পারেনা তা একে দেখলে বোঝা যায়। স্বামীর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে আছে তাই কোন অভাবই এর কাছে অভাব বলে মনে হয় না। কোনদিন ভাল কাপড় পরতে পায়না—ভাল কিছু খেতে পায়না—মুখের হাসিটী কিন্তু লেগেই আছে।

কিছুদিন পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকি, বিশেষ দেখাশুনা হয় না। একদিন মার কাছে শুনলাম কিছু দিন হল ভেতরে ভেতরে জ্বর চেপে রেখে হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে যক্ষ্মা হয়েছে বলে। ভাবলাম যা আলো বাতাসহীন ঘর আর যা খাটুনী ঐ অসুখ হওয়াই স্বাভাবিক। একদিন অসুখ বেড়েছে শুনে দেখতে গেলাম নীচে। দেখলাম এতদিনে সত্যই শরীরটা শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে। খালি মনে হতে লাগল—পৃথিবীর মেয়াদ ত ফুরিয়ে এল—প্রিয়তম স্বামী ও ছেলে মেয়েকে ছেড়ে যেতে কত না কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখে শুধু সেদিন হাসল কথা বলতে পারল না। এমন সময় অফিস থেকে সেদিন স্বামী তার ঘরে ঢুকলেন। স্বামীকে দেখে হয় তো তার মুখে আরক্তিম আভা কিছু ফুটে উঠবে এই ভেবে তার মুখের দিকে চেয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। দেখি স্বামীর দিকে কি সে এক ভীষণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাতে বিন্দুমাত্র স্নেহ বা অভিমান কিছুই নেই। আছে যেন এক অপমানের জ্বালা আর প্রতিহিংসার ভাব। কিছুক্ষণের পর চোখ নাবিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। আমি দেখতে পেয়েছি তা যেন বুঝতে পারেনি।

তারপরের দিন কলেজ থেকে হেঁটে ফিরছি। হঠাৎ রাস্তায় দেখি এক মাথা সিঁদুর মাথায় কোন মৃতা ভাগ্যবতীকে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম এ আমার নিতান্ত পরিচিতা—আমার বাড়ীর নীচের তল্লাটই সেই কল্যাণী গৃহবধূ—মনে হল গৃহ কোণে থেকে থেকে যে বাইরের কোন লোক দেখলে কত সঙ্কুচিত হয়ে উঠত—আজ সে এতগুলি অপরিচিতের কাছে কত না বিব্রত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে যাবে নাকি? তারপর মনে হল আমি ত এখনও মর্ত্তের মানুষ পার্থিব দেহ ও অনুভূতি নিয়ে সব জিনিষ বিচার করছি। মৃতা বান্ধবীর আর ইহ জগতের অধিবাসিনী নন—তিনি এখন পার্থিব লজ্জা সুখ দুঃখ সবের কত উর্দ্ধে। মৃত্যুর সঙ্গে তার আগে আর ভাল করে পরিচয় ছিল না—তাই তাকে সত্যি করে উপলব্ধি করতে গিয়ে ভেতরটায় এক প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলাম।

—কালও যে মানুষটী হেসে অভিবাদন করেছে আজ সে অবচেতন স্পন্দনহীন—কাল যে ছিল আজ সে নাই।—কোনমতে বাড়ী ফিরে গিয়ে মার সঙ্গে নীচে গেলাম—কর্ত্তব্য পালন করতে হবে সেই বৃদ্ধার প্রতি যিনি মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্ত্তে আহ্বান করেও যেতে পারলেন না—রয়ে গেছে এই দুঃখের সংসারে আরও কিছুদিন হাবুডুবু খেতে।—ও

ভোগ করতে পারত জীবনকে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত দিয়ে সেই চলে গেল বড় অসময়ে। এই সব ভাবছি—ক্রন্দনরতা শাশুড়ীর কয়েকটী কথায়—চিন্তার স্রোত বাধা পেয়ে গেল—বৌমা আমার জীবনে একটী দিনের জন্য সুখ পায়নি। পুত্রের মা হয়ে স্বীকার করছি সন্তান মানুষ করতে পারিনি। প্রতিদিন মাঝ রাত্রে ফিরে আসত কোথা থেকে ভগবান জানেন। পাছে আমি শুনতে পাই বৌমা তাড়াতাড়ি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করেদিতেন। স্বামীর দৈন্য তার মার কাছেও লুকোতে চাইবার কি চেষ্টা। আমি কান পেতে সবই শুনতে পেতাম। কোনদিন মাটিতে ফেলে মারের শব্দ চরিত্রহীন স্বামীর কাছে আত্ম-বিক্রয়ের গ্লানি থেকে নিজেকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টার ফল বা শাস্তি। প্রতিদিন মাতাল স্বামী বিছানা নষ্ট করে ফেলত—তাড়াতাড়ি চাদর বদলে স্বামীকে শুইয়ে স্নানের ঘরে চলে যেত—কাজ শেষ করে ভোর বেলার স্নান শেষ করে রান্না চড়িয়ে আমায় দরজা খুলে দিত—মনে করত আমি কিছুই জানতে পারতাম না। মা হয়ে পুত্রের সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারতাম না লজ্জায়।

শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল দিদিদের কথা—স্বামীকে নিয়ে যে মেয়ে সুখী—তাকে দরিদ্রতা কোন দুঃখই দিতে পারেনা। তখন বুঝতে পারলাম তার সেই মরণের আগের দিনের প্রতিহিংসা ভরা দৃষ্টির অর্থ। সারাজীবন যে স্বামীর কাছ থেকে অসহনীয় দুঃখ পেয়ে গেছে—একটী জীবকেও তার একমাত্র কন্যাকেও জানতে দেয়নি—পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে শুধু ক্ষমাহীন দৃষ্টি দিয়ে তাকেই শুধু জানিয়ে গেছে যে সে ক্ষমা করতে পারেনি—শুধু স্ত্রীর কর্ত্তব্য—জননীর কর্ত্তব্য—পুত্রবধূর কর্ত্তব্য করে গেছে আজীবন, মুখে হাসি বুকে কান্না নিয়ে। একটী বইয়ে পড়েছিলাম পাথরও যে দুঃখে চৌচির হয়ে যায়—মানুষ তা সহ্য করতে পারে। মানুষের সুখ দুঃখ বাইরে থেকে বিচার করতে গিয়ে নিজেরা কতনা প্রতারিত হই। মানুষকে আমি চিনি বা তার সব কিছু বুঝি এই স্পর্ধা যেন জীবনে আর না করি।

মনের অগোচরে একটু অভিমান দেখা দিয়েছিল—বছরের কতদিন এক সঙ্গে বসে গল্প করেছি—এক দিনও কি কিছু বলতে পারতনা—তবে আর কিসের ভালবাসা।

হঠাৎ মনে হল সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলছে—

"পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে—
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনি খুলে
ভুলতে যদি পার তবে—
সেই ভালগো যেও ভুলে"

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছি। একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঢুকে পড়লাম—ছেলে মেয়ে দুটী কেমন আছে দেখবার সাধ হল। মেয়েটী বড় হয়েছে তার মুখে শুনলাম তার আগের মা মারা যাবার কিছু দিন পরেই বাবা আর এক মা আনেন। বৃদ্ধ মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক আত্মীয়া বলেছিলেন—তাঁর কাছ থেকে শুনলাম অফিসের বড় বাবুর বোনের বিয়ে হচ্ছিল না—তিনি খুব করে ধরলেন আর সন্তানদের মুখ চেয়ে ওদের বাবা ছমাসের মধ্যেই বিয়ে করেছিলেন। খানিক পরে একটী ১৮ কি ১৯ বছরের মেয়ে আমার সামনে হাসি মুখে দেখা দিল। আবার কোন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুনতে হবে ভেবে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। আর কোন দিন সে বাড়ী যাইনি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

জ্বালাতে হবে।—আমি একদিন বলেছিলাম তোমার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটী লিখেছেন—

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহ কাজে—
প্রভাত আসে তোমার দ্বারে—পূজার সাজি ভরি—
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ ডালা ধরি।"

একটুখানি হেসে নীচে নেবে গেল। মনে মনে ভাবতাম স্বামীর আগমনের সময় হয়েছে—তাই আমার কাছে ছলনা করে চলে যায় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

যতক্ষণ ছাতে থাকতাম সমাজের বিষয়, দেশের বিষয় অনেক আলোচনা হত। সব সময় মুখে একটা প্রসন্ন হাসি দেখতে পেতাম। একদিনের জন্য ভুলেও সংসারের কোন অভিযোগ করতে শুনিনি। ঘরগুলো কি অন্ধকার—বা ঐ টাকায় সংসার চালান কত কষ্ট ইত্যাদি একদিনের জন্যও বলতে শুনিনি। অন্যদের কাছে শুনেছিলাম অল্প মাইনের চাকরী করেন ওর স্বামী। শুধু একদিন ওদের ঘরে বসে আছি—ঘরে একটীমাত্র আম ছিল—সেটী ঠাকুমা নাতিকে দিলেন। মা বলল দিদিকে একটু তার ভাগ দিতে। ঠাকুমা বলে উঠলেন ঐ একটা আম তা আবার দিদিকে দিতে হবেনা। ছেলেটী না দিয়েই খেয়ে ফেলল—২ বছরের বড় দিদি ম্লান মুখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শাশুড়ী উঠে যাবার পর সে শুধু একটুখানি বলল "নিজের ছেলেকে ইচ্ছা মতন ভাল কিছু শেখাতে পারিনা এই বড় দুঃখ আমার"। এছাড়া কোন অভিযোগই করতে শুনিনি। আমরা ধারণা করে নিয়ে ছিলাম স্বামীকে নিয়ে ইনি বড় সুখী। আমার দিদিরা এঁকে দেখে আমায় বলতেন মনে সুখ থাকলে দারিদ্রতা যে কোন দুঃখই দিতে পারেনা তা একে দেখলে বোঝা যায়। স্বামীর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে আছে তাই কোন অভাবই এর কাছে অভাব বলে মনে হয় না। কোনদিন ভাল কাপড় পরতে পায়না—ভাল কিছু খেতে পায়না—মুখের হাসিটী কিন্তু লেগেই আছে।

কিছুদিন পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকি, বিশেষ দেখাশুনা হয় না। একদিন মার কাছে শুনলাম কিছু দিন হল ভেতরে ভেতরে জ্বর চেপে রেখে হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে যক্ষ্মা হয়েছে বলে। ভাবলাম যা আলো বাতাসহীন ঘর আর যা খাটুনী ঐ অসুখ হওয়াই স্বাভাবিক। একদিন অসুখ বেড়েছে শুনে দেখতে গেলাম নীচে। দেখলাম এতদিনে সত্যই শরীরটা শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে। খালি মনে হতে লাগল—পৃথিবীর মেয়াদ ত ফুরিয়ে এল—প্রিয়তম স্বামী ও ছেলে মেয়েকে ছেড়ে যেতে কত না কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখে শুধু সেদিন হাসল কথা বলতে পারল না। এমন সময় অফিস থেকে সেদিন স্বামী তার ঘরে ঢুকলেন। স্বামীকে দেখে হয় তো তার মুখে আরক্তিম আভা কিছু ফুটে উঠবে এই ভেবে তার মুখের দিকে চেয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। দেখি স্বামীর দিকে কি সে এক ভীষণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাতে বিন্দুমাত্র স্নেহ বা অভিমান কিছুই নেই। আছে যেন এক অপমানের জ্বালা আর প্রতিহিংসার ভাব। কিছুক্ষণের পর চোখ নাবিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। আমি দেখতে পেয়েছি তা যেন বুঝতে পারেনি।

তারপরের দিন কলেজ থেকে হেঁটে ফিরছি। হঠাৎ রাস্তায় দেখি এক মাথা সিঁদুর মাথায় কোন মৃতা ভাগ্যবতীকে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম এ আমার নিতান্ত পরিচিতা—আমার বাড়ীর নীচের তলারই সেই কল্যাণী গৃহবধূ—মনে হল গৃহ কোণে থেকে থেকে যে বাইরের কোন লোক দেখলে কত সঙ্কুচিত হয়ে উঠত—আজ সে এতগুলি অপরিচিতের কাছে কত না বিব্রত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে যাবে নাকি? তারপর মনে হল আমি ত এখনও মর্ত্তের মানুষ পার্থিব দেহ ও অনুভূতি নিয়ে সব জিনিষ বিচার করছি। মৃতা বান্ধবীর আর ইহ জগতের অধিবাসিনী নন—তিনি এখন পার্থিব লজ্জা সুখ দুঃখ সবের কত উর্দ্ধে। মৃত্যুর সঙ্গে তার আগে আর ভাল করে পরিচয় ছিল না—তাই তাকে সত্যি করে উপলব্ধি করতে গিয়ে ভেতরটায় এক প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলাম।

—কালও যে মানুষটী হেসে অভিবাদন করেছে আজ সে অবচেতন স্পন্দনহীন—কাল যে ছিল আজ সে নাই।—কোনমতে বাড়ী ফিরে গিয়ে মার সঙ্গে নীচে গেলাম—কর্ত্তব্য পালন করতে হবে সেই বুদ্ধার প্রতি যিনি মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্ত্তে আহ্বান করেও যেতে পারলেন না—রয়ে গেছেন এই দুঃখের সংসারে আরও কিছুদিন হাবুডুবু খেতে।—ভোগ করতে পারত জীবনকে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত দিয়ে সেই চলে গেল বড় অসময়ে। এই সব ভাবছি—ক্রন্দনরতা শাশুড়ীর কয়েকটী কথায়—চিন্তার স্রোত বাধা পেয়ে গেল—বৌমা আমার জীবনে একটী দিনের জন্য সুখ পায়নি। পুত্রের মা হয়ে স্বীকার করছি সন্তান মানুষ করতে পারিনি। প্রতিদিন মাঝ রাত্রে ফিরে আসত কোথা থেকে ভগবান জানেন। পাছে আমি শুনতে পাই বৌমা তাড়াতাড়ি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করেদিতেন। স্বামীর দৈন্য তার মার কাছেও লুকোতে চাইবার কি চেষ্টা। আমি কান পেতে সবই শুনতে পেতাম। কোনদিন মাটিতে ফেলে মারের শব্দ চরিত্রহীন স্বামীর কাছে আত্ম-বিক্রয়ের গ্লানি থেকে নিজেকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টার ফল বা শাস্তি। প্রতিদিন মাতাল স্বামী বিছানা নষ্ট করে ফেলত—তাড়াতাড়ি চাদর বদলে স্বামীকে শুইয়ে স্নানের ঘরে চলে যেত—কাজ শেষ করে ভোর বেলার স্নান শেষ করে রান্না চড়িয়ে আমায় দরজা খুলে দিত—মনে করত আমি কিছুই জানতে পারতাম না। মা হয়ে পুত্রের সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারতাম না লজ্জায়।

শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল দিদিদের কথা—স্বামীকে নিয়ে যে মেয়ে সুখী—তাকে দরিদ্রতা কোন দুঃখই দিতে পারেনা। তখন বুঝতে পারলাম তার সেই মরণের আগের দিনের প্রতিহিংসা ভরা দৃষ্টির অর্থ। সারাজীবন যে স্বামীর কাছ থেকে অসহনীয় দুঃখ পেয়ে গেছে—একটী জীবকেও তার একমাত্র কন্যাকেও জানতে দেয়নি—পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে শুধু ক্ষমাহীন দৃষ্টি দিয়ে তাকেই শুধু জানিয়ে গেছে যে সে ক্ষমা করতে পারেনি—শুধু স্ত্রীর কর্ত্তব্য—জননীর কর্ত্তব্য—পুত্রবধূর কর্ত্তব্য করে গেছে আজীবন, মুখে হাসি বুকে কান্না নিয়ে। একটী বইয়ে পড়েছিলাম পাথরও যে দুঃখে চৌচির হয়ে যায়—মানুষ তা সহ্য করতে পারে। মানুষের সুখ দুঃখ বাইরে থেকে বিচার করতে গিয়ে নিজেরা কতনা প্রতারিত হই। মানুষকে আমি চিনি বা তার সব কিছু বুঝি এই স্পর্ধা যেন জীবনে আর না করি।

মনের অগোচরে একটু অভিমান দেখা দিয়েছিল—বছরের কতদিন এক সঙ্গে বসে গল্প করেছি—এক দিনও কি কিছু বলতে পারতনা—তবে আর কিসের ভালবাসা।

হঠাৎ মনে হল সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলছে—

"পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে—
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনি খুলে
ভুলতে যদি পার তবে—
সেই ভালগো যেও ভুলে"

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছি। একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঢুকে পড়লাম—ছেলে মেয়ে দুটী কেমন আছে দেখবার সাধ হল। মেয়েটী বড় হয়েছে তার মুখে শুনলাম তার আগের মা মারা যাবার কিছু দিন পরেই বাবা আর এক মা আনেন। বৃদ্ধ মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক আত্মীয়া বলেছিলেন—তাঁর কাছ থেকে শুনলাম অফিসের বড় বাবুর বোনের বিয়ে হচ্ছিল না—তিনি খুব করে ধরলেন আর সন্তানদের মুখ চেয়ে ওদের বাবা ছমাসের মধ্যেই বিয়ে করেছিলেন। খানিক পরে একটী ১৮ কি ১৯ বছরের মেয়ে আমার সামনে হাসি মুখে দেখা দিল। আবার কোন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুনতে হবে ভেবে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। আর কোন দিন সে বাড়ী যাইনি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

একদিনের স্মৃতি

শ্রীগীতা ঘোষ

সেদিন পরিচয় হোলো একটি চীনে মেয়ে-গরিলা সৈনিকের সঙ্গে। বয়স তার মোটে একুশ, ছোট্টখাট্ট দেখতে, ছোট ছোট বব্ চুল, খাকী পোষাক পরা। এই বয়সেই মেয়েটি ক্যাপটেন হয়েছে। আলাপ জমানোর মস্ত অন্তরায় যে মেয়েটি একটুও ইংরেজি বা ভারতীয় কোনও ভাষা বলতে পারে না। নিজের ভাষা ছাড়া মনোভাব প্রকাশের তার আর কোনও উপায় নেই, ভাব ভঙ্গীতে কতটুকু বোঝানো যায়।

এই মেয়েটির সঙ্গে একটি চীনে ছেলে ছিল; সম্পর্কে কেউ নয়, পূর্ব্ব আলাপও নয়। কলকাতায় মেয়েটি পৌছানোর পর চীন-সেনা-সম্প্রদায় থেকে এ ছেলেটিকে মেয়েটির সঙ্গে ঘুরবার অনুমতি দিয়েছে; ছেলেটি দোভাষীর কাজ করে। ছেলেটি অসামরিক, চীনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়া সেরে কোলকাতায় এসেছে, এখানকার সংস্কৃতি আর সভ্যতার কিছু পরিচয় নিয়ে আবার দেশে ফিরে যাবে।

মেয়েটিকে আমরা সবাই ঘিরে, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলুম; মেয়েটির যখন বয়স সতেরো তখনই সে সেনা-দলে ভর্তি হয় তারপর ক্রমান্বয়ে চার বছর ধরে সমর শিক্ষা লাভ করে, একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্যাপটেন হয়ে বর্ম্মাতে প্রেরিত হয়। মেয়েটির সঙ্গে আর সাতটি মেয়ে ঐ বাহিনীতে ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলুম যে তাকে বন্দুক ঘাড়ে করে, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে চলে, শত্রু গুলি করতে হোতো-কিনা? হেসে বলেছিল যে শত্রু গুলি করা ওদের না-বলা কাজের মধ্যে; তবে বন্দুক ওদের সর্ব্বদা বইতে হোতো—আসলে মেয়েটির কাজ ছিল যে, যে সব পুরুষ সৈনিক, লেখাপড়া জানে না তাদের হয়ে চিঠিপত্তর লিখে দেওয়া, আবার তাদের চিঠিপত্তর আসলে পড়ে শোনানো। খুব ভালই লাগতো তার এ কাজ—সৈনিকরা তার ওপর এত নির্ভর করতো, আর একটুখানি কারো জন্যে লিখে বা পড়ে দিলে তারা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করতো—খুব অল্পেই খুসী।

মেয়েটির মতে বর্ম্মা যে শত্রুর হাতে পড়লো তার কারণ ভেতরে ভেতরে ধর্ম্মযাজকদের (ফুংগি) বিশ্বাসঘাতকতা—তারাই নাকি মন আর বিশ্বাস ভাঙ্গাতে সবচেয়ে পারদর্শ।

তাকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি শত্রু হাত থেকে বেঁচে ফিরলে কি করে, নিশ্চয় মেয়ে বলে, নয়?" মেয়েটি শুনে খুব মজা উপভোগ করলো; খুব হাসতে লাগলো। তারপর খুব মিষ্টি করে কত কী যে বলে চল্‌ল তার চীনে-বন্ধুটিকে, তা আমরা কিছুই বুঝলুম না, বন্ধুটি খুব হাসতে লাগলো। আমরা বল্‌লুম, "এ কেমনতর, আমরা যে কিছু ভাগ পাচ্ছিনে এ হাস্যপরিহাসে—" ছেলেটি বল্‌লে "বলছি, বলছি আগে সবটা শুনে নি।" তারপর বল্‌লে ছোট্ট করে মেয়েটির বর্ম্মা থেকে কলকাতায় আসার কাহিনীটুকু।

চীনেরা যখন পিছিয়ে পড়ছিল, তখন তাদের মধ্যে কেমন একটা গোলমাল সৃষ্টি হয়, ঠিক শৃঙ্খলা রেখে কাজ হয়ে উঠ্‌ছিল না, এই সময় শত্রুপক্ষ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড চালায়—যাকেই সামনে পায় তাকেই গুলি করে। চারটি পুরুষ আর মেয়েটি যখন পালাচ্ছিল, তখন মেয়েটির সামনেই দু'জন পুরুষ সৈনিক শত্রু গুলিতে প্রাণ হারায়। মেয়েটির উদ্দেশ্যে চার বার গুলি ছোঁড়া হয় কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য্যভাবে অক্ষত থেকে যায়—রাখে কৃষ্ণ মারে কে—সামনেই একটী নদী পড়ায় ওরা সেই নদী বক্ষে আশ্রয় নেয়, এবং মেয়েটি ডুব সাঁতারে সে যাত্রা রক্ষা পায়। এছাড়াও মেয়েটির জীবন বার দুই বিপন্ন হয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি ভয় পেয়ে কখনই ধরা দেয়নি। আমাদের সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছিল, যখন মেয়েটি বলেছিল ১৮ দিন ক্রমান্বয় ও গলাবধি জলে নিমজ্জিত রেখে অগ্রসর হয়েছিল। একাদিক্রমে ঐ অশেষ পরিশ্রমের ভেতর হয়তো ৫।৭ দিন কোনও আহার্য্যই পায়নি। গ্রামবাসীরা ওদের ভয় করতো, অর্থাৎ গ্রামবাসীরা কী স্বদেশী কি বিদেশী সবাইএর ওপরই বিশ্বাস হারিয়েছিল। গ্রামবাসীদের কাছে মেয়েটি কখনও কোনও সাহায্য পায়নি, যাতে তার পথশ্রম দূর হয়, বা দ্রুত তার গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারে। শেষকালে মেয়েটী যখন সহরে এসে পৌছালো, তখন জামাকাপড়ের অবস্থা যেমন শোচনীয় তেমনি শোচনীয় শরীরের অবস্থা—গায়ের চামড়া অদ্ভুত দেখতে হয়েছে।

এখন মেয়েটি কী করবে জিজ্ঞেস করাতে বল্‌লে, প্রথম সুযোগেই এয়োরোপ্লেনে করে দেশে ফিরে যাবে, দিন দশ বারোর ভেতর একটা সম্ভাবনা আছে, তাই সে অধীরভাবে দিন গুনছে।

জিজ্ঞেস করা হলো "দেশে কে কে আছে?"

বল্‌লে "মা, বোন, ভাই।"

আবার প্রশ্ন হলো "মন কেমন করছে বুঝি?"

বল্‌লে "না, শত্রু ধ্বংস করবার জন্যে হাত নিষপিষ করছে—।"

আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম।

"পঙ্গপাল"

শ্রীরাধারাণী মুখার্জ্জি

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"

কিন্তু কোন্ উপায়ে?

প্রভাত তখনও উজ্জ্বল প্রভাতের রূপ ধরতে পারে নাই; উষার স্বল্পাভা পূর্ব্ব গগনে গভীরতম হয়ে উজ্জ্বলতায় আত্ম-প্রকাশ করবে মাত্র।

কিন্তু সে আশায় বসে থাকতে পারে না আত্মরক্ষার্থী নরনারী। তারা তখন বেরিয়ে পড়ে, নীড়হারাদের মত।

আজ হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় সেই কথাটাই "ঐ কারা চলে যায় পঙ্গপালের মত"। মনকে অবিশ্বাস করলেও চোখকে অবিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু এ দেখায় কি পরমার্থ লাভ হোল। এদের চোখের পাতায় অশ্রুর শিশির; মাথার চুলগোলো পাঁশুটে; গায়ের চামড়ায় খড়ির গুড়ো। শীর্ণ হাতে বহু দিনের পরিত্যক্ত মর্চ্চে পড়া—ওভালটিনের খালি কৌটা। পরিধানে শতচ্ছিন্ন শতগ্রন্থিযুক্ত কৌপীন। আবরণহীন বুক থেকে পাঁজর কখানা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। এরা কি মানুষ নয়?

মনকে প্রবোধ দিতে পারি না।

ভাবলুম এদের অদৃষ্ট বলে কোন জিনিষ নেই। তাই এরা চলেছে নির্দ্দেশহীন কোন অজানার সন্ধানে।

এদের জিজ্ঞাসা করি…?

খেঁকী কুকুরের মত তীব্র ঝাঁঝাল কণ্ঠে উত্তর দেয় "কোথাও না"। ভয়ে দুহাত পিছিয়ে পড়তে হয়।……

চলতে চলতে তারা থেমে যায়, এক জায়গায়। সে জায়গাটায় বোধ হয় তাদের ডেকে ছিল কিন্তু ওরাও তো এদের স্নেহ করে না—, অজস্র গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে যায়। চোখ মেলে চাইলে—বিরক্ত হয় খদ্দেররা। রাগের চোটে' দোকানদার জল ছিটায় পঙ্গপালের গায়ে। তবু তারা নড়ে না; বিশ্বের বুভুক্ষার জ্বলন্ত ছবির মত।

ডাষ্টবিনের এঁটো-পাত লেহন করে জিভ্ দিয়ে।……

চোখের উপর এই কাণ্ড দেখে বুদ্ধি লোপ পেতে বসে। বুক ফাটা চীৎকার করতে ইচ্ছা হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভেসে উঠে পরাধীনতার শৃঙ্খল,—সমাজের অবিচার। মনে পড়ে কত শত ঐতিহাসিক চিত্র। মন গুমরে উঠে—"কোন্ অধিকারে মানুষ মানুষকে এমন পশুত্বে পরিণত কর্ত্তে পারে"।

তারা আবার চলতে সুরু করে। দূর পাড়াগাঁ থেকে এসেছে জনপূর্ণ সহরের বুকে। কঙ্কালসার-দেহখানার ভার, শীর্ণ পায়ে যারা বইতে পারে না, তারা ট'লে প'ড়েছে মাঝ রাস্তায়; সেখানে তারা পেয়েছে চিরশান্তির কোল।

নারী চলে লঘু পদে; আর পারে না ক্লান্তিতে অবস হয়ে বসে পড়ে গাছ তলায়। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই, তাদের ঘুম এসে জোটে চোখের পাতায়। তখন শেয়াল, শকুনও ভয় করে না তাদের "সজীবতাকে"।

* * *

আবার তারা চলে! চলার পথে চায়ের দোকানে দেখে অনুরূপ ভিড়; কিন্তু সেটা তাদের বিলাসের নেশা। তারা ফিরেও চায় না ঐ সবহারাদের দিকে। তারা বোঝে না বিলাসের নেশায়, দেবতার অভিশাপ কতটুকু ক'রে বর্ষিত হচ্ছে। আর পঙ্গপালদের প্রতি কতখানি অবিচার হচ্ছে, তাও তারা ভাবে না! সভ্যতার এই বিলাসের আলোকটুকু ঢেকে যাবে ঐ "জীবন্ত কঙ্কালের ছায়ায়"।

এই দীর্ঘশ্বাস! এই ব্যথিত বুভুক্ষুর অন্তিমের বিষাক্ত বাতাস, ধূমায়িত ক'রে তুলবে একদিন সভ্যতার শুচিতাময় বায়ুকে।

এই নগণ্য ভিক্ষুকের মৃত্যুরূপ "সেপ্‌টিসিমিয়া" একদিন বিস্তৃত হয়ে প'ড়বে মোহগ্রস্ত রূপোদ্‌ভ্রান্ত সমাজের বিশ্বের স্বরূপ সুঠাম শরীরে! কেউ বাঁচতে পার্ব্বে না; রক্ষা করবার শক্তি নেই কারো; এ জগতের এই নিয়ম। নিরন্নের এই কাতর ক্রন্দন, অনাহারের করাল ছায়া পতিত আত্মার এই অভিশাপ;—একি ব্যর্থ হবার? মূক মৌন, নিস্তরঙ্গ, প্রাণহীন হৃদয়ের পশ্চাৎ থেকে জেগে উঠে সভ্যতার অট্টহাস। যবনিকা ঘনাইয়া আসে ধরণীর ও প্রান্ত থেকে। আত্মরক্ষার্থীদের আশার আলোতে নিরাশার তিমির ঘনিয়ে আসে। রবি অস্তোন্মুখ! ওরা এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। পেটের মধ্যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা এসে ভিড় করে। চলার শক্তি লোপ পেয়ে যায়।

"ক্ষীণ কণ্ঠের স্বরে ঘুরে মরে মানুষের বিধাতা।"

তবু তারা চলবে; তাদের বাড়ীতে আছে কারও অনাহারী খঞ্জ মাতা, অন্ধ পিতা। এ চলা ছন্দহীন, অর্থহীন। তারা যেমন ভাবে এসেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ফিরে যাচ্ছে। উষার স্বল্পালোকে বেরিয়েছে আশার অন্বেষণে "পঙ্গপালের" মত; গোধূলির ধূম্রালোকে আবার ফিরে চলেছে আশ্রয় তরে। মাঝ রাস্তায় প'ড়ে থাকে কতকগুলো নিষ্প্রাণ দেহ।

ধরিত্রী চঞ্চলা হয়ে উঠে। তার গরীব সন্তানদল ফিরে যায় রিক্ত হস্তে।

সূর্য্য অস্তাচলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে অনাহারক্লিষ্ট প্রাণটির অস্ত হয়েছে, ক্ষুদ্র কুটীর খানিতে তারই ছোট্ট মেয়েটী পৌছে এতক্ষণে। ম্লান তারকা মিট্‌ মিট্‌ ক'রে চায়। সরে যেতে পারে না; কেঁদে বুক ফাটাতে পারে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে কুটীর কাঁপিয়ে—বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

হাত থেকে মর্চ্চে পড়া শূন্য ওভাল্‌টিনের কৌটাটা পড়ে যায়। মেয়েও বাপের খোঁজে ছুটে যায়।

হায় দেশ! হায় দেশবাসী!!

সার্থকতা

শ্রীসরসীবালা দেবী

পঙ্কের মাঝে পঙ্কজ ফুটে
সৌরভে দিক ভরে,
কণ্টকে ঘেরা গোলাপ ফুলটী
সবারি চিত্ত হরে।
জলদের বুকে বিজলীর খেলা
মধুর মধুর অতি,
মণীর মাঝারে ফণীন্দ্র নাথ
তাই এ উজল জ্যোতিঃ!
পাপের পিছনে পুণ্যের আলো
সমধিক শোভা ধরে,
জীবনের পরে মুক্তির আশা
জীবন ধন্য করে।

অজন্তা ইলোরার পথে

শ্রীবিভা চৌধুরী

বাংলাদেশ ছেড়ে মারাঠিদের দেশে এসে পৌছেছি। মারাঠিদের কথাই এখানে বিশেষ নয়, আমার জীবনে খানিকটা দেখার কথাই একটু লিখছি।

এক শনিবার বিকেলে পুণা থেকে রওনা দিলাম অজন্তা ও ইলোরার উদ্দেশ্যে। ঐ সময়টা ছিল দেওয়ালীর ছুটী, মারাঠিদের মস্ত বড় পর্ব্ব, সবাই চলেছে সহর ছেড়ে বাইরে, তাই অসম্ভব ভীড়। ট্রেণে পা দেবার যায়গা নেই, অনেক কষ্টে ট্রেণের দরজা খোলা হোল, দেখি মস্ত বড় কামরা আর তেমনি ভীড়। ট্রেণে এক মারাঠির সঙ্গে আলাপ—তারা ছুটিতে চলেছে তাদের দেশে, আসছে বম্বে থেকে। সঙ্গে বছর আটেকের একটী ছোট্ট মেয়ে। মেয়েটী বেশ স্মার্ট, বম্বের স্কুলে পড়ে, সারা ট্রেণে আমাদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠলো। সে আমাদের শোনাল মারাঠী, ইংরাজী ও বাংলা গান; মারাঠীর মুখে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে বেশ খুসী হয়ে উঠলাম! জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি এ গান শিখলে কোথা থেকে?" বল্লে "এমনি পথে তোমাদের মত এক বাঙালীর কাছে।" পরে আব্দারের সুরে বল্লে, "দাওনা আমায় আর একটা গান শিখিয়ে।" ভারি মুস্কিলে পড়লাম, আমিত মোটেই গান জানিনা। ভেবেছিল বুঝি ওদের দেশের মত আমাদের দেশের প্রায় সকল মেয়েই গান জানে। বাঁচিয়ে দিলেন আমাদের দলেরই এক সঙ্গী। আধ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটী সুন্দর ভাবে গানটা শিখে নিল, এমনি করে আমাদের আনন্দ দিয়ে ওরা রাত ১১টায় ওদের দেশের ষ্টেশনে নেমে গেল।

আমরা রাত একটায় মনমাদ ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। অজন্তা ও ইলোরা নিজাম রাজ্যে। মনমাদ থেকে নিজামের ট্রেণে ৭০ মাইল দূরে আওরঙ্গাবাদ যেতে হয়। সেখান থেকে মোটরে অজন্তা ও ইলোরা যাওয়া যায়। নিজামের ট্রেণগুলি খুব সুন্দর, নিজামের নিজস্ব মুদ্রা আছে। ব্রিটিশের টাকারও চলতি আছে। কিন্তু সব জায়গায় তা চলেনা। সে জন্য আমরা প্রথমেই আমাদের টাকা পয়সাগুলি বদলে নিলাম। রাত্রি তিনটায় আমরা আওরঙ্গাবাদে এসে পৌছলাম। ষ্টেশন থেকে সব যাত্রীকে আগে Custom houseএ যেতে হবে, তারপর তার গন্তব্য স্থানে। Custom house থেকে ফিরতে আমাদের প্রায় ভোর হয়ে এলো। সকাল আটটায় মোটর এলো প্রথমে ইলোরা যাবার জন্য, আওরঙ্গাবাদ থেকে ইলোরা ৩৬ মাইল দূর। পথে দৌলতাবাদ ও আওরঙ্গজেবের সমাধি দেখে যাব। দৌলতাবাদ দুর্গ একটী দেখবার জিনিষ, সাম্রাজ্য রক্ষা করার কি দুরূহ আকাঙ্খা। আগ্রার দুর্গের মত বিলাসের আবাসস্থল নয়। বড় বড় ফটকের ভিতর দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হয়। দুই পাশে বিশাল বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। আলাউদ্দিন যখন এই দুর্গ অধিকার করেন তখন নিজের কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ "চিনামহল" নামে একটি খুব উঁচু মিনার তৈরী করেন, এখনও সেটী আলাউদ্দিনের বিজয় ঘোষণা করছে। এই দুর্গ প্রথমে হিন্দুদের অধিকারে ছিল, তখন দৌলতাবাদের নাম ছিল দেওগিরি। হিন্দুর স্থাপত্য শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আজও স্পষ্ট ভাবে আছে। এই দুর্গের চারিদিকে জলপূর্ণ গভীর পরিখা। দুর্গটি পরিখা থেকে সোজাভাবে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। দুর্গের অনেক অন্ধকার ঘর ও সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা উপরে উঠলাম, এখান থেকে দৌলতাবাদের দৃশ্য অতি চমৎকার। অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী, দূরে আওরঙ্গাবাদের গৃহরাজি। পাহাড়ের মাঝে একটি গণপতির মূর্ত্তি। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সমস্ত দুর্গটি কামান দিয়ে ঘেরা। এই দুর্গটির ওপরে উঠতে ও দেখতে আমাদের তিন ঘণ্টার উপর লাগলো। দৌলতাবাদ থেকে আওরঙ্গজেবের সমাধি দেখতে গেলাম, আড়ম্বর শূন্য সমাধি। চন্দ্র, সূর্য্য স্নেহভরে সমস্ত দিনরাত্রি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বর্ষা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়ে যায়, এতটুকু আভরণ নেই তার ওপর। ভারতের অধীশ্বর নিঃস্ব দীনের মত মাটির

নীচে ঘুমোচ্ছে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের নিজাম ভারত অধীশ্বরের সমাধির চারিদিক মার্ব্বেল পাথর দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন কিন্তু নির্ম্মল আকাশ আজও তার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে রয়েছে, সেখানে এতটুকুও বাধা পায়নি। মনে পড়লো আওরঙ্গজেবের কথা; যত দোষই থাক, তার সমাধি দেখে কেন জানিনা ভক্তিতে মনটা ভরে উঠলো।

এখান থেকে আমরা সোজা রওনা হলাম, ইলোরার উদ্দেশ্যে। বেলা প্রায় দেড়টার সময় ইলোরাতে গিয়ে পৌছলাম।

ইলোরার মন্দির বা গুহাগুলি পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ভাবে তৈরী। এতে আছে ৩৫টি গুহা, দুই প্রান্তের দুই গুহার ব্যবধান প্রায় দেড় মাইল, গুহাগুলি পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। ৩৫টি গুহার মধ্যে প্রথম ১২টি বৌদ্ধযুগের, ২০টি হিন্দু যুগের ও ৩টি জৈনদের, বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈনদের মন্দির পর পর তৈরী।

প্রথম গুহাটি খুব চিত্তাকর্ষক নয়। তবে এইটি সব চেয়ে প্রাচীন ও দ্বিতীয় গুহাটির সঙ্গে এর সংশ্রব আছে। এটি একটি বিহার, অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের থাকবার স্থান। এর মধ্যে ৮টি কুঠুরী। দ্বিতীয় গুহাটি খুব বিশাল ও চিত্তাকর্ষক, এটি একটি বিশাল উপাসনা গৃহ, উপাসনা গৃহের সিঁড়িগুলিতে ছোট ছোট "বামন" খোদাই করা। বুদ্ধ সিংহাসনে উপবিষ্ট, এই মূর্ত্তিটি দেখলেই মনে হয় যেন বুদ্ধ সামনে উপবিষ্ট ভক্তগণকে উপদেশ দিচ্ছেন। তৃতীয় গুহাটি বিহার, এখানে বুদ্ধ পদ্মাসন। তাঁর দুই পাশে ছত্রধারী, মাথার উপরে গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি, মন্দিরের মধ্যস্থলে অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণির মূর্ত্তি; তাঁর চারিদিকে ছোট ছোট চারটি করে কুঠুরী। প্রত্যেক কুঠুরীতে একটি করে মূর্ত্তি আছে। চতুর্থ গুহায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

পঞ্চম গুহাটিকে বলা হয় মহাত্মার, এটি একটি বিশাল বিহার। ২৪টি স্তম্ভের উপর এটির ছাদ তৈরী, এর মধ্যে ভিক্ষুদের থাকবার ২০টি কক্ষ আছে, তিনটি প্রশস্ত পথের মধ্যে দুই সারি সারি পাথরের বেঞ্চ, এটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিদ্যালয় বলে মনে হয়।

এরপর নবম গুহা পর্য্যন্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই; দশম গুহাকে বিশ্বকর্ম্ম বলা হয়। এটি একটি উপাসনা গৃহ, এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তিটি বিশাল।

১১নং গুহাটিকে দোতাল বলা হয়। এই গুহাটি দোতালা। এখানে বুদ্ধ পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি।

১২নং গুহাটীকে তেতাল বলা হয়। এটী তেতালা। প্রথম তালায় বুদ্ধের আসন চক্রের উপর, তাঁর সামনে দুইটী হরিণ দ্বিখণ্ডিত, বুদ্ধের মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন, দ্বিতীয় তালায় বুদ্ধের আসন সিংহের উপরে। মূর্ত্তি জগতের কল্যাণার্থে ভগবানের নিকট প্রার্থনা রত, তেতালায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ।

১৩নং গুহা হইতে বৌদ্ধ যুগের শেষ ও ব্রাহ্মণ যুগের আরম্ভ।

১৪নং গুহার নাম "রাবণ-কা-কই"। রাবণ কৈলাশ পাহাড় তুলতে চেষ্টা করছেন, পার্ব্বতী ভয়ে মহাদেবের নিকট আশ্রয় নিলেন, মহাদেব রাবণকে কৈলাশের নীচে চেপে রেখে দিচ্ছেন, এই উপাখ্যানটী পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা।

১৫নং গুহার নাম "দশ অবতার"। এখানে চামুণ্ডা, ইন্দ্রানী, বরাহী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মাতৃমূর্ত্তি, বরাহ বিষ্ণু ইত্যাদির মূর্ত্তি মন্দিরের চারিদিকে খোদাই করা। এখানে আছে অনেক বৈষ্ণব ও শৈব মূর্ত্তি, এটী দোতালা।

১৬নং গুহার নাম "কৈলাস"। ইলোরার গুহাগুলির মধ্যে এইটীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; এটী খুব বড় বড় উঠানসহ একটী বিশাল মন্দির। এটী প্রস্থে ১৫৪ ফুট, দৈর্ঘ্যে ২৭৬ ফুট ও ১০৭ ফুট উঁচু। অসংখ্য সুন্দর ভাস্কর্য্যে মন্দিরটী পূর্ণ। কৈলাসে প্রবেশ করিলেই প্রথমে দশভুজা শিব ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার পরেই হাতে পদ্ম ও পাশে ঐরাবত সহ লক্ষীদেবীর বিশাল মূর্ত্তি, কমলে কামিনী মূর্ত্তি বলে মনে হয়। চত্বরের দুই পাশে বিশাল দুটী হস্তী মূর্ত্তি।

মন্দিরের দক্ষিণে ঢাকা ১১৮ ফিট লম্বা একটী বারান্দা আছে এর মধ্যে ১২টী কুঠুরী। অন্নপূর্ণা, শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু, শঙ্খচক্রধারিণা চতুর্ভুজ পার্ব্বতী, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, নারায়ণ, নৃসিংহ, ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ শিব ও অর্দ্ধ নারীশ্বর ইত্যাদি মূর্ত্তি শোভিত। পূর্ব্বদিকে বারান্দাটী লম্বায় ১৮৯ ফিট লম্বা এখানকার ১৯টী কুঠুরীতে ত্রিশূলধারী চতুর্ভুজ কাল ভৈরব শিব, পাশে পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর করধৃত কপালভৈরব শিব, পদতলে পদ্ম। ত্রিশূলধারী শিব, দক্ষিণ হস্ত পার্ব্বতীর মস্তকে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরসহ ত্রিশূলধারী চতুর্ভুজ সিদ্ধিযোগী শিব, ত্রিশূলধারী নৃত্যরত শিব। বাঘছাল, স্কন্ধে ত্রিশূল, বাম হস্তে শিঙ্গা ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু, সম্মুখে পার্ব্বতী ভূপাল ভৈরব শিব, দক্ষিণে নন্দী, বামে পার্ব্বতী, সর্পধৃত চতুর্ভুজ শিব বা ভৈরব। চতুর্ভুজ মহাদেব ও নন্দী, জপমালা ও কমণ্ডলু হস্তে, পাশে রাজহংস চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। সর্প ও নন্দী সহ শিব, ত্রিশূলধারী নন্দী সহ শিব। শিবের জটা হ'তে গঙ্গার উৎপত্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, শিব প্রভৃতি দশ অবতার মূর্ত্তি, ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী শিব। ষড়ভুজ বীরভদ্র রক্তাসুরকে অস্ত্রাঘাত করছে, তার এক এক বিন্দু রক্তে তার সমকক্ষ এক একটী দৈত্যের সৃষ্টি হচ্ছে। শিব পার্ব্বতীর বিবাহ, কালী, পার্ব্বতী ও ভৃঙ্গী ইত্যাদির ১৯টী মূর্ত্তি বিদ্যমান। পশ্চিম হইতে উত্তর দিকের বারান্দাটী ২২০ ফিট লম্বা এবং বারটী কুঠুরী সমন্বিত।

শিব মার্কণ্ডেয়কে পরাজিত করছে, শিব ও কিরাত, শিব ও পার্ব্বতী পাশা খেলায় নিযুক্ত। শিব ও পার্ব্বতীর সম্মুখে নারদ বীণা বাজাচ্ছেন, রাবণ কৈলাশ উত্তোলনের চেষ্টা করছে, শিব পার্ব্বতীকে পুরাণ শোনাচ্ছেন ইত্যাদি ১২টী মূর্ত্তি আছে।

কৈলাশের একটী অংশ দোতলা, দোতলায় লক্ষী, ব্রহ্মা, সরস্বতী ও শিবের মূর্ত্তি।

কৈলাশ মন্দিরের গৃহতল প্রায় একতালার মত উঁচু, সারি সারি হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তির উপর মন্দিরটী তৈরী। মন্দিরের একধারে রামায়ণের ঘটনা ও অন্যধারে মহাভারতের ঘটনাগুলি খোদাই করা। এই খোদাইগুলি দেখে সম্পূর্ণ রামায়ণ ও মহাভারত শেখা যায়। মন্দিরের ভেতরে বেদীর উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও পাশে পার্ব্বতী বা ভবানীর মূর্ত্তি, সামনের নাটমন্দির ১৬টী কারুকার্য্য করা থামের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটীকে রংমহাল বা চিত্রিত প্রাসাদ বলা হয়।

সে সময় কৈলাস যে কি সুন্দর ছিল তা কল্পনাও করা যায় না। এই মন্দিরটী তৈরী করতে কত অর্থ ব্যয়, কত পরিশ্রম, কত শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কৈলাস দেখে যত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি, আগ্রার তাজমহল দেখেও যেন তত হইনি। ভাবি তাজমহল তৈরী করা হয়ত মানুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু কৈলাস যেন সম্ভবের বাইরে। পনের হাজার বছর আগেকার ভারতের কথা ভাবি,—সভ্যতার আদি গুরু। শুধু সভ্যতার নয়, স্থাপত্য শিল্পের এত বড় নিদর্শন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রের যুগে, বিজ্ঞানের যুগে এ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এক এক সময় মনে হয় ইলোরাতে যদি শুধু কৈলাসই থাকত তবু ইলোরাতে আসার সমস্ত কষ্টটুকুও সার্থক। খালি মনে হয় এই বিরাট শিলাময় রচনাকে বোধ হয় পৃথিবীর কোনও প্রাচীন কীর্ত্তি অতিক্রম করতে পারেনি।

কৈলাস ছাড়িয়ে ৪টী গুহার পর ২১নং গুহার নাম রামেশ্বর। এটী প্রকাণ্ড উঠান সমেত একটী বিশাল মন্দির। এই মন্দিরে নৃত্যপরায়ণ মহাদেবের একটী প্রকাণ্ড সুন্দর মূর্ত্তি ও ভীষণ দর্শনা একটী কালী মূর্ত্তি আছে। রামেশ্বরের পর আটটী গুহা, তারপর ২৯নং গুহার নাম "সীতা-কি-নাহনি" বা সীতার স্নানমন্দির। এই মন্দিরের কিছু অংশ চিত্রিত, কিন্তু এখন তার প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এটীর কারুকার্য্য খুবই সুন্দর এখানে হরপার্ব্বতীর বিবাহের সমস্ত দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটী পার্ব্বত্যস্রোত আছে, মন্দির থেকে এই স্রোতে যাবার সিড়ি আজও বর্ত্তমান।

৩১নং গুহার নাম "ছোট কৈলাস"। কৈলাসেরই অনুকরণে এটী তৈরী।

ইলোরার উত্তরে তিনটী জৈন গুহা বর্ত্তমান। দুইটী ইন্দ্রসভা নামে পরিচিত। এই দুইটী দোতালা। মন্দিরের দক্ষিণে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। সপ্তমস্তক সর্প তাঁহার মস্তকে ছায়া দান করছে। একটী ছত্রধারী স্ত্রীমূর্ত্তি, উত্তরে গোমাতা মূর্ত্তি, মাঝখানে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি কিছুটা ধ্যানরত বুদ্ধের সহিত তুলনীয়। মন্দিরের মণিকোঠায় হস্তীপৃষ্ঠে বহু অলঙ্কার শোভিত ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও নীচে মহাবীর।

৩৩নং গুহার নাম "জগন্নাথ সভা," এর সব মূর্ত্তিই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইলোরার এই শেষ গুহা।

জৈন গুহাগুলিতে যেতে হলে অনেক উঁচু নীচু পার্ব্বত্য পথ দিয়ে যেতে হয়।

ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তিনটী ধর্ম্মই পর পর আত্মপ্রকাশ করেছিল; প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রচারক স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত্নও নিয়েছিলেন প্রচুর। এঁরা প্রধানতঃ যুক্তি, তর্ক দিয়েই নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন হত্যা বা ধ্বংস দিয়ে নয়। ভারতের এই তিনটী ধর্ম্মের শান্তিপূর্ণ বিকাশ ইলোরাতেই দেখতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানরা এইসব মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি, তবে ক্ষতি অনেক করেছে। প্রায় মূর্ত্তির সামনের কিছু কিছু অংশ তারা ভেঙ্গে ফেলেছে।

বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তিগুলি খুবই বিশাল। হিন্দু যুগের মূর্ত্তিগুলি যদিও বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তির মত নয়, তবুও সেগুলিকে বিশালই বলতে হবে তবে এর কারুকার্য্যও উন্নত স্তরের কিন্তু জৈন যুগের কারুকার্য্যও এর চেয়ে আরও সূক্ষ্ম। এর মূর্ত্তিগুলি আবার হিন্দুযুগের মূর্ত্তিগুলির থেকে আকারে আরও একটু ছোট। জৈনরা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ যুগের কাছ থেকে এই শিল্পক্ষেত্রে ঋণী।

ইলোরা থেকে একমাইল দূরে অহল্যাবাঈর মন্দির। পথে আওরঙ্গজেবের স্ত্রী রাবেয়া দুয়োরাণীর সমাধি মন্দির। এটাকে ভারতের "দ্বিতীয় তাজমহল" বলে। শ্বেত পাথরের তৈরী সমাধি মন্দির, বাগান, জলধারা, ফটক সবই আগ্রার তাজমহলের মত। পার্থক্য শুধু যমুনা নদী তার পাশ দিয়ে কুল কুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ছাতকের কমলাবাগে

শ্রীসত্যবতী ঘটক

বাংলার সাধারণ ঘরের মেয়েরা তাদের গৃহকারাগারে চিরবন্দিনী কিন্তু আজও তাদের মন যাযাবরের মত সুদূর পারের অচেনা দেশের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যের মাঝে অহরহ ঘুরে মরে' খুঁজে মরে চির নূতনের সন্ধান। তারাও চায় বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ····· বহুদিন হলো মনের আনাচে কানাচে এই চিন্তাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল; আর মনটাও খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্ করে খাঁচার দ্বার ভেঙ্গে উন্মুক্ত উদার গগনতলে অবাধ বিচরণের জন্য আকুল হয়ে উঠ্‌ছিল। সহসা সুযোগ এলো—বাবা বল্লেন: এবার ছাতকে আসাম বেংগল সিমেন্ট কোম্পানির উদ্বোধন উৎসবে আমরা যাব, তোমাকেও সংগে নেবো।

আনন্দে আমার মন নেচে উঠ্‌লো ময়ূরীর মত। কত আশা উৎসাহের নব নব সুরের রেশ হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝংকার দিয়ে উঠ্‌লো, প্রস্তুত হতে লাগলুম। শ্রীহট্টের সেই পাহাড়িয়া, বন্ধুর, শ্যামায়মান গ্রামখানির একটা কল্পনারঙিন চিত্র আমার মানস পটে ভেসে উঠলো,···এতদিনের স্বপ্ন আজ বুঝি সফল হতে চল্‌লো।

হেমন্তের এক হিমশীতল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমাদের ষ্টীমারখানা সিরাজগঞ্জ ঘাট ষ্টেশন থেকে ছাড়্‌লো। তখন কেবলমাত্র রজনীর শেষ অন্ধকার তার ঝিঙের বিচির মত কৃষ্ণ অঞ্চল গুটিয়ে ঘুমের দেশে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর পূর্ব্বদিগন্তে সোণার আলো ছড়িয়ে সূর্য্যিমামা সহাস্য বদনে উদিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রভাত রশ্মি যমুনার কালো জলের বুকে ঝিক্ ঝিক্ করে উঠ্‌লো। আমাদের ষ্টীমারখানা শাদা পরীর মত যমুনার জল কেটে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো, দুহাতে লুফে নিতে লাগলো সুবর্ণখচিত রশ্মিপুঞ্জ। তারপর আমরা জগন্নাথগঞ্জ এসে আসাম মেলে চেপে বসলুম।

অবাধ গতিতে আমাদের বুকে নিয়ে আসাম মেল দুরন্ত বেগে ছুটে চল্লো। আমি ট্রেণের বাতায়ন ভেদ করে চেয়ে রইলাম হেমন্তের আর্দ্র অলস উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে। দুধারে শিশির ভেজা সবুজ ঘাসগুলি নবারুণ কিরণে ঝলমল করছে। পথি পার্শ্বস্থ ছোট বড় বৃক্ষলতা যেন জাপবাহিনীর ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে যে যার পথে। তখন আমার মনে হলো:

থাক্ না পড়ে খাওয়া দাওয়া অন্য কিছু নাই বা হল,
বাংলা মায়ের শ্যামল রূপে পরাণ আজি উতরোল।

···ট্রেনটা কখন যে এসে ময়মনসিংহে দাঁড়িয়েছে জান্‌তেই পারিনি। বাবা এসে বল্লেন, সতু, এই বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে নাও এখানে গাড়ী এক ঘণ্টা থাকবে·····বাবার ডাকে আমার যেন স্বপ্ন ভংগ হল। আবার সেই মামুলি খাওয়া দাওয়া। ওটা না হলে কি নিতান্তই চলে না? সত্যি বুঝি তাই; না খেলে চলেই না, তাই খেয়ে নিতে হল, ট্রেনটির বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যেন আমার ভাল লাগছিল না। তবু থামতেই হবে। তারপর নীল পতাকার অব্যর্থ ইংগিতে গাড়ী ছুটে চল্লো অবাধ গতিতে কোন্ অজানার হাতছানিতে। গৌরীপুর, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি কত ছোট বড় ষ্টেশন পার হয়ে এই লৌহদানব এসে থামলো মেঘনার উপর ভৈরবের বিখ্যাত পুলের কাছে। ক্ষণেক থেমেই আবার সে গমগম্ করতে করতে লৌহবর্ত্মকে বীর পদভরে দলিত করে চলে গেল। সন্ধ্যার খানিক আগে আমরা আখাউড়া জংসনে এসে পৌছিলাম। এখানে আমাদের গাড়ী বদলাতে হোলো। আগের ট্রেণখানি আমাদের ফেলে রেখেই চলে গেল চট্টগ্রাম অভিমুখে।

ক্লান্ত দিনমণি গা ঢেকে দিয়েছে গোধূলির স্বর্ণশয্যায়। ধীরে ধীরে মৃদে আসছে তার অলস আঁখি পল্লব। আর সন্ধ্যা রাণী তার জ্যোৎস্না খচিত রজত শুভ্র উত্তরীয় খানা বিছিয়ে দিচ্ছে নিস্রিত রবির দেহের উপর। প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমাদের ট্রেন খানা ছাড়লো; আমরা পাহাড়িয়া দেশে এসে পড়লুম। দুইধারে কুড়ি পঁচিশ হাত উঁচু জমি; তার মাঝ খান দিয়ে চলেছে লৌহবর্ত্ম সুদূর শিলং পর্য্যন্ত, আবছা আলোয় দেখা গেল কালো কালো বন জংগল যেন জ্যোছনা সাগরে স্নান করছে। মাঝে মাঝে দু একটা অগ্নিকুণ্ড দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে। আর চারিদিকে বন্ধ্যা রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঝিল্লীর একটানা শব্দ কানে এসে বাজছে। হেমন্তের স্নিগ্ধ আকাশে জ্যোছনার জোয়ার লেগেছে, চাঁদ যেন পড়েছে অসংখ্য তারার মণিমালা।

রাত্রি দশটার পর আমরা ফলাউড়া ষ্টেশনে এসে আবার গাড়ী বদল করলাম। শিলং বাজারের গাড়ীতে উঠে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো, ইনি ডাক বিভাগে চাকরী করেন। টাঙ্গাইলে কিছুদিন ছিলেন। তিনি চারাবাড়ীর চমচমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। রাত্রি দুইটার সময় আমরা সিলেট বাজারে পৌছিলাম। পথের পরিচিত ভদ্রলোকটী প্রথমশ্রেণীর বিশ্রামাগারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। চারাবাড়ীর চমচম্ আমাদের সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে তাকে জল খাওয়ান হলো।

সারারাত আমরা ওয়েটিং রুমে কাটালুম। পরদিন সকাল বেলা আসাম বেংগল সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে চার পাঁচ জন লোক এবং রিজার্ভ মোটর গাড়ী এলো অতিথিদের নিয়ে যেতে। ভোরের কুয়াসা ভেদ করে যাত্রীপরিপূর্ণ একখানি ট্রেন এসে দাঁড়ালো ষ্টেশনের উপর। তার ভেতর থেকে নামছে অধিকাংশই ছাতকের যাত্রী, সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টারগণ। তাঁদের সঙ্গে বাবার অনেকক্ষণ আলাপ হলো। ট্যাক্সিতে বসে বাবা আমাকে ডিরেক্টারদের সম্বন্ধে অনেক বল্লেন। এঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, ক্যাপিটালিষ্ট ইন্দ্রসিংহ। ইনি এককালীন কুড়ি লাখ টাকার সেয়ার কিনে ফ্যাক্টারির চেয়ারম্যান হয়েছেন। গৌরীপুর, দ্বারভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানের মহারাজা এবং জমিদারগণ অংশীদার হিসাবে এসেছেন। চা ও কেক দিয়ে আমরা প্রাতরাশটা পথে সেরে নিলাম। তারপর হিটলারের ট্যাংকবাহিনীর মত ছুটলো আমাদের মটরগুলি একটীর পর আর একটী সেই খাসিয়া পাহাড়ের উপর মানুষের গড়া সুসজ্জিত, নবভাবে রূপায়িত আধুনিক গ্রামটীর অভিমুখে।

চোটবেলায় ভূগোলে পড়তাম্ ছাতক কমলার জন্য বিখ্যাত। তখন কল্পনায় কতবার এই কমলা বাগানের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই, কিন্তু তৃপ্তি তো পাইনি, আজ চলেছি বাস্তবের সেই কমলা বাগানে প্রাণ দিয়ে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। সিলেট থেকে দশক্রোশ যেতে হয় ছাতকে যেতে হলে। আমাদের গাড়ীগুলি যখন সহর ছেড়ে দু' তিন ক্রোশ এগিয়ে গেল, তখনও খাসিয়া পাহাড় সাত আট ক্রোশ। এতটা দূর থেকেও একটী

মনোরম ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়লো, পথের দু' ধারে মেঘ, শ্যামল ভূমির মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু একখানি গ্রাম, ঘন সবুজ গাছ পালায় প্রাচীর ঘেরা। সম্মুখে সীমাহীন পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট শান্তিময় গৃহগুলি যেন শ্যামলের পূজা অর্ঘ রচনা করছে। আমি মনের আনন্দে মেঘের শ্রান্ত শ্যামল ছবিখানা দেখছিলাম। হঠাৎ বাবা বল্লেন ঐ যে আমাদের ফ্যাক্টারীর চিমনীর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি আগেও পাহাড়টাকে যত দূরে দেখেছিলাম তখনও ততদূরেই আছে, তার গা থেকে সরু দুটী লৌহ নল অনবরত কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে। মনে হলো পালামৌয়ের কথা।

গ্রামের মাঝে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। পাশ দিয়ে অপ্রশস্ত গভীর সুরমা নদী বয়ে গেছে কত দূরে দৃষ্টির গোপন অন্তরালে। এপারে গ্রাম ওপারে পাহাড় ধুসরে শ্যামলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে ফ্যাক্টরীর ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, লিলিপুটদের সহরের মত। এপার থেকে দেখা যাচ্ছে রং বেরঙের কাগজ এবং ছোট ছোট পাথর দিয়ে নদীর পার থেকে ফ্যাক্টরীর ঘর পর্য্যন্ত সাজান তোরণগুলি আমাদের ইশারায় শুধু ডাকছে। লঞ্চে আমরা নদী পার হলাম। বাবা বল্লেন: সতু ঐ দেখ কমলার বাগান। তখন সবে অঘ্রাণের প্রথম সপ্তাহ। হেমন্ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে শীতকে। সবুজ কমলায় তখন কেবল হলুদের আভা জেগে উঠেছে। নদীর বুকে কমলাগুলো দুলছে লঞ্চের ঢেউ লেগে, আর মনে হচ্ছে সবুজ আর কালোয় মিশে যাবে। যত কাছে যাচ্ছিলাম তত আমার আনন্দ বেড়ে যাচ্ছিল। লঞ্চ ঘাটে ভিড়তেই দু'জন স্বেচ্ছাসেবক এসে আমদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রলিতে তুলে দিল।

বেলা এগারটায় আমরা ছাতকের পাহাড়িয়া বাংলোয় এসে পৌছিলাম, মাননীয় অতিথিদের জন্য ফ্যাক্টরী থেকে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিল। আমাদের এক আত্মীয় এখানে সপরিবারে থাকেন। তিনিই সেদিনের জন্য তাঁর বাসায় আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে গেলেন। তিন দিনের পথশ্রমে শরীর ও মন উভয়ই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে মনে যথেষ্ট বেরোবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও বিশ্রাম করতেই হলো। সন্ধ্যে বেলায় কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করেই সেদিনের দিন পঞ্জী শেষ করলুম।

পরদিন ভোরে ইচ্ছে থাকলেও উঠ্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল। ফ্যাক্টরির কর্ম্মকোলাহল বাতাসে ভেসে আসছে। প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লুম। পথে বেরিয়ে বাবা বল্লেন: কোন দিকে যাবে? আমি বল্লুম: যার জন্য উৎসবে সুদূর বাংলা থেকে এলাম তাকেই আগে দেখে আসি। বাবা বল্লেন: বেশ, তাই চলো প্রথম ঢুকলাম ল্যাবোরেটরিতে দোতালা ইটের ঘর, প্রধান কাজ বিলাতী মাটী পরীক্ষা করা। নীচের ঘরটায় অনেক রকম এ্যাসিড বোঝাই আলমিরা, এখানে সিমেন্ট নানা আকারে জমা হয়, সেগুলি ওপারে নিয়ে কলের চাপে ভাঙ্গা হয়। কোনটাতে কত ডিগ্রি চাপ লাগছে তা খাতায় লেখা হচ্ছে। এখান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে প্রকাণ্ড storage হলে এলাম। হলটী লম্বায় ১৩০ ফুট প্রস্থে ৫০ ফুট এবং সমতল ভূমি থেকে ৩৫ ফুট উঁচু। এটী তিন ভাগে বিভক্ত; একটীর ভিতর Limestone, দ্বিতীয়টীর ভিতর Clinker এবং শেষেরটীর ভিতর Coal প্রচুর পরিমাণে জমা থাকে। তার সঙ্গে লাগানো আর একটি ঘরে উঠতেই দেখতে পেলাম একটী বড় গর্ত্ত পাথর ভরতি। সেখান থেকে ওপরে উঠে গেছে একটী বিশাল লৌহ সিঁড়ি, দালানের ওপরে ওঠার সিঁড়ির মত, মানুষ যেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই পাথরগুলিও সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটী লৌহ পাত্রের ভিতর গড়িয়ে পড়ছে। এই কলের সাহায্যে এক হাজার লোকের কাজ একটা লোকে অনায়াসে করছে। আমরা উপরে উঠ্‌লাম। এখানে সিমেন্টের সবগুলি উপকরণ একত্র মিশ্রিত হয়ে পুড়ে, পোড়া কয়লার আকার ধারণ করছে। সে কি ভীষণ অগ্নিস্ফুলিংগ, না দেখলে বর্ণনা দিয়ে বোঝান কঠিন। আগাগোড়া লৌহ দিয়ে মোড়ানো একটী পাত্র। কি রকমভাবে পুড়ছে দেখবার জন্য ফাঁক আছে। সেখানে সর্ব্বদা দুজন লোক নীলরংয়ের কাঁচ দিয়ে লক্ষ্য করছে। আমি সেই কাঁচ হাতে নিয়ে ভীষণ আগুনের খেলা দেখে নিলাম। আমার এক আত্মীয় বৈজ্ঞানিক এখানে কাজ করেন, তিনি আমাদের সঙ্গে করে সব দেখাচ্ছিলেন। আমায় বল্লেন: এই বেশী

দেখো না চোখ খারাপ হয়ে যাবে। কার কথা কে শুনবে, আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার কি খেয়াল হলো সেই পোড়ানো ঢিল কয়েকটী তুলে নিলাম বাড়ীর সবাইকে দেখাবার জন্য। সেই ঢিলের আকারের জিনিষগুলি কলের সাহায্যে গুড়া হয়ে নানারূপ নলের মধ্য দিয়ে আর একটী কোঠায় চলে যাচ্ছে। এখানে একটী লৌহবাক্সের ন্যায় বড় পাত্রে সিমেন্ট জমা হয়ে থাকে। তার সঙ্গেই মাপবার কল। একজন লোক এই কলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখানোর জন্য দুজন কুলি চারটি বস্তা এনে কলের ভিতর গলিয়ে দিল। কল টিপে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বস্তাগুলি ভরতি হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কুলীরা বস্তা নামিয়ে নিল।

এগুলি দেখে বাইরে এলাম। এখানে রয়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটি সাইলস (Sylos)। এর ভেতর (স্লারি) Slurry এবং সিমেন্ট প্রচুর পরিমাণে জমা থাকে ইহা দেখতে আমাদের দেশের ইন্দারার মত, গেঁথে ওপরের দিকে উঠে গেছে প্রায় পঁচিশ ফিট। নীচের দিকে খুব ছোট আকারের একটা লৌহ দরজা। এর ওপরে উঠে দেখবার জন্য লৌহ সিঁড়ি আছে। আমাদের অবশ্য উঠা হয় নি। সব শেষে আমরা এলাম workshop দেখতে। সামনে ভীষণ ভীড়, আমাদের দেখে একজন স্বেচ্ছাসেবক রাস্তা করে দিল। প্রকাণ্ড হলের মাঝখানে খানিকটা খোলা যায়গা চলাফেরা করবার জন্য। দুই ধারে অনেক রকম মেসিন বসানো রয়েছে ঘরের পেছনে লোহা গলাবার জায়গা। তরল লোহা ঢেলে নানা রকম সাইজ করে নানা জিনিষ তৈরী করা হয়। একস্থানে দেখলুম রোপ ওয়ের সমস্ত জিনিষ তৈরী হচ্ছে, ভোলাগঞ্জ পাহাড় থেকে শিলং পাহাড়ে সমস্ত জিনিষ সরবরাহের জন্য। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে এই মেসিনারী বিলাত থেকে আসে, কাজেই এর অনেক missing parts এইখানে তৈরী হয়েছে। প্রায় সমস্ত মেসিনারী চব্বিশ ঘন্টাই কাজ করে। এবং বর্ত্তমানে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় ২৫০ টন সিমেন্ট তৈরী হয়।... দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গেল আমরা বাসায় ফিরলাম।

বারটা চল্লিশে আমরা উদ্বোধন উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। সভাপতি হলেন আসামের গভর্ণর। আসামের শিক্ষাসচিবের পত্নীও এসেছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় শেষ হতে প্রায় এক ঘন্টা লাগলো। আসামের গভর্ণর, লেডী গভর্ণর এবং ডিরেক্টার বোর্ডের সকলে ফ্যাক্টরী দেখতে গেলেন। তাঁদের দেখবার সময় সমস্তগুলি মেসিন একত্র চালান হয়েছিল। ফ্যাক্টরী, (ওয়ার্কসপ) workshop প্রভৃতি স্থানে সমস্ত মেসিনারী একমাত্র পাওয়ার হাউসের কারেন্টের সাহায্যে চলে। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় কোম্পানি থেকে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছিল। বাংলোতে গিয়ে ক্ষুধিত উদরকে পরিতৃপ্ত করলুম। দ্বিপ্রহরের থেকে সূর্য্যের আলো নিভে এলো। আকাশ ঢেকে এলো জলভরা কালো মেঘে, হিমশীতল উত্তরি বায়ু শরীরের হাড়গুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুল্‌লো। বৃষ্টি পড়তে লাগলো ঝির ঝির করে। সেদিন আর আমাদের বেড়ানো হলো না।

সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন—তাদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সিমেন্ট কোম্পানির পূর্ব্ব ইতিহাস উঠলো। বাবা বল্লেন আজ তোমরা দেখছ পাহাড়ের উপরে বসানো ছবির মত সুন্দর সহরটি, কিন্তু আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম পাথর এনালাইজ করতে এবং দেখতে তখন এই স্থান ছিল ঘন জংগলে ঢাকা বাঘ ভাল্লুকের রাজ্য। এখানে ওখানে পাহাড়িয়াদের লতাপাতায় ঘেরা দুচারটি কুটির। আমরা সেই পাহাড় জংগল ভেঙে কত অন্ধকার দুর্গোগময় রাতে চলে গেছি পাহাড়ীদের সাহায্য নিয়ে জীবন বিপন্ন করে। আজ সেখানে একটি বৃক্ষলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, আছে পরিচ্ছন্ন একটি ক্ষুদ্র সহর। জনকোলাহল বিরল, নিস্তব্ধ, থমথমে, ভীতিপ্রদ, বিপদজনক স্থানের পরিবর্ত্তে যন্ত্রদানবের ভয়ানক গর্জ্জন ও জনকোলাহলে মুখরিত স্থান এখান থেকে দু, তিন মাইল দূরে পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে পাথর কাটা অস্ত্র দিয়ে সিমেন্টের জন্য বহুল পরিমাণে পাথর আনা হয় ঐ স্থানকে কোয়ারী বলে। সেখানকার গ্রামের নাম ভোলাগঞ্জ। এর অনতিদূরে বৃষ্টির জন্য বিখ্যাত চেরাপুঞ্জি সহর। এই কাজের প্রসঙ্গে চেরাপুঞ্জিতে গিয়েছিলাম। কত স্থানে কত খরস্রোতের উপর দিয়ে মাঝিরা অবলীলাক্রমে নৌকা বেয়ে নিয়ে গেছে, এতে তাদের নিপুনতা ছিল যথেষ্ট এবং সাহসও ছিল অসীম। সে সমস্ত

স্নানে স্রোতের বেগ আমাদের হৃদয়কে ভয়াতুর করেছে, মাঝিরা সেখানে সাহস দিয়ে বলেছে : বাবু কিছু ভয় নেই। কাজ শেষ করে প্রায় আমরা ফিরতাম সন্ধ্যে বেলায়, পথের দু ধারে কমলা বাগান। তার পাকা ফল আহার করতাম আর তৃষ্ণা নিবারণ করতাম ঝরণার জলে। যেন রূপকথার তেপান্তরের মাঠে হত আমাদের বিজয় অভিযান।……

গল্প চল্লো অনেক রাত অবধি। সবই চলে যায়। নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে বৃষ্টির আঘাত লাগ্‌ছে ঝম্ ঝম্। ইচ্ছা হল ঝঞ্ঝা উন্মত্ত ছাতকের আকৃতি দেখবো।……জানালা খুলে দিলাম আলোক সমারোহপূর্ণ পটের ছবিটির বুকে। কে যেন এক পোঁছ কালি মেখে দিয়ে গেছে ; মুছে গেছে সমস্ত জগত যেন আমার নয়ন থেকে। মনে হচ্ছে পবন-রথে চড়ে চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টি ধারা এই মহা উৎসবে যোগ দিতে আসছে, তার পিছনে আসছে একটা বিরাট কৃষ্ণকায় দেহরক্ষী হাতে তার চক্‌চকে রূপালী বাঁকা তরোয়াল, মাথায় লোহার মুকুট।

ক্রমশঃ

প্রাক্তন

অঞ্জলি সরকার

নারী,
অস্তরীপের তটপ্রান্তে যাদের সমাধি-মন্দির,
যারা নাবিক, যাদের
কাজ মৎস্য-শিকার,
যাদের কারবার বাণিজ্যের বোঝা নিয়ে,
এদের যারা পরিচালক, হে নারী,
তাদের জন্য প্রার্থনা কর।

উচ্চারণ কর শক্তি-মন্ত্র
সেই সব নারীদের জন্য—যাঁরা
দেখেছে তাদের স্বামী-পুত্রের
যাত্রা—দেখেনি প্রত্যাবর্ত্তন :
আর তাদের জন্যও প্রণতি জানাও
যারা সমুদ্র-তরীতেই ছিল, যাদের
অভিযানের পথ-সমাপ্তি
মরুপথে—বারিধির ওষ্ঠপুটে ;
অথবা সেই অন্ধকার কণ্ঠনালীতে
যে কখন উদ্‌গিরণ করবে না—অথবা
সেইখানে, যেখানে তাদের কাছে
সমুদ্র-ঘণ্টার শাশ্বত দেবদূতের ধ্বনি
কোনদিন গিয়ে পৌছবে না।*

---

* টি. এস. ইলিয়টের কবিতা অবলম্বনে

অকৃতকার্য্য

শ্রীসিপ্রা দত্ত

এম. এ. পাশ করে দু'বছর চাকরীর জন্য হেথা সেথা টো টো করে শরীরের সব রক্ত জল করে জীবন থম্‌কে দাড়ায় মাঝ পথে। নিজের জীবনের ব্যর্থতায়—নিজের অকৃতকার্য্যতায়, আহত সিংহের মত গোঙায়ে উঠে—আঃ কত আশা……কত আশঙ্কা এখনও তো উদ্দাম গতি নিয়ে চলছে উন্মাদের মত।

ফুটপাথের কিনারায়, লাইট পোষ্টের গায়ে নিজের অলস, অবশ শরীরখানা ঠেকিয়ে, চোখ দুটো তোলে ধরে কণ্ট্রোল অফিসের দিকে—দশ, বিশ, যা ছায় কিন্তু হায়, তা-কি সম্ভব? এযে শুধু জীবনের "ব্যর্থ প্রয়াস"। আস্তে আস্তে পা ফেলে বাঁধানো পিচের উপর দিয়ে অবিরাম হেঁটে হেঁটে স্লিপারের তলাটা খেয়ে গিয়েছে। একটি ফিতা ছিড়ে যাওয়ায় আবার থেমে,—আর একটি ফিতার ভেতর জড়িয়ে দিয়ে চল্লো।—বুকের প্রত্যেকটী কল কব্জা যেন কে নিষ্ঠুর হাতে মুষড়ে দিয়েছে—তার বিনিময়ে বের হয়ে আসলো, একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস—। নিশ্বাস পতনের এই বেসুরা ছন্দটি নিজের কানেও অতি করুণ, অতি বিশ্রি ঠেক্‌লো। কতক্ষণের মধ্যে ডালহৌসী স্কোয়ারে এসে একটু থেমে ভাবলো—সে দিন সে হেমন্ত বাবুকে বলেছিলে, ওঁর আফিসে একটি কাজের জন্য—এখন ওঁর সাথে দেখা করতে যাবে কিনা। পকেট থেকে একটী সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে টান্‌ছে—মনে মনে বলছে, এই শেষ বাপু, আর এদিকে মাড়াবোনা—কি ফাজিল নেশা—এই শাস্তিটাই তো তার এ অভ্যাস করেছে, শেষ টান দিয়ে বাকি সিগারেটটুকু ছুড়ে ফেলে চল্লো—হেমন্তবাবুর অফিসের দিকে। প্রকাণ্ড চারতালা বিল্ডিং। জনস্রোত অবিরাম যাওয়া আসা করছে, চারি দিকে ব্যস্ততা মুখর সুর। দুটি নেপালী দারোয়ান টহল দিচ্ছে নীরবে বন্দুক কাঁধে নিয়ে ফটকের কাছে।

জীবনকে দেখে রাঙ্গা চোখ দুটো তোলে একটী দারোয়ান। জীবন ত্রস্ত হয়ে পকেট থেকে একটি কাগজের টুকরো বের করে নিজের নামটা সই করে দিয়ে বল্লে—বড় বাবুর সঙ্গে দেখা করবো। একটি দারোয়ান চলে যাওয়ার পর অস্থটি সোজা হয়ে দাড়ালো, জীবন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, সারাটা রাস্তা রোদে একবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নীচ পকেট থেকে—আধ ময়লা রুমালটা বের করে ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা মুছে নিয়ে সামনে একটী টুলে বসে পড়লো। ভাবতে লাগলো—এই হেমন্তবাবুর কথা, তিনি কেন বুঝবেন গরীব জীবনের ব্যথা, সে তো তার নিষ্ঠুর দরিদ্রতার কথা সবই পূর্বে বলে দিয়েছে। আর তার সাথে আত্মীয়তাই বা কি? পিসিমার জ্ঞাতি দেবর। আর মুখ থেকে—অস্পষ্ট স্বরে বের হলো কেন দেবে না? একটী দরিদ্র পরিবার না খেয়ে শুকিয়ে তিলে তিলে মরণ পথের যাত্রী হবে, আর ধনীরা টাকার ওপর দিব্বি নাকে তেল দিয়ে—তা তো অসহনীয়……কিছুতেই সইতে পারবে না সে। ভাবতে ভাবতে জ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে; হঠাৎ চমকে উঠে দারোয়ানের কর্কশ আওয়াজে। মনটা অপ্রত্যাশিত ভাবে আনন্দে দুলে উঠলো, দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যেতে হবে!—বাবুর ডুইং রুমে। সামনে এগিয়ে চল্লো—পুরু কার্পেট আটা ডুইং রুমে পা ফেলতে গিয়ে জীবন আৎকে উঠে—কোন প্রকারে নিজকে সামলিয়ে নিলো।

হেমন্তবাবু দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লেন—আরে, এই যে তুমি……এসো। তারপর তোমাদের বাড়ীর সকলে কুশলে তো? ব্যস্তভাবে কলমখানা টেবিলের উপর রেখে, একটি গদি আটা চেয়ার দেখিয়ে বল্লেন, বসো। চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে, একটু আমতা আমতা করে বল্লে জীবন, সেদিন আপনাকে সব বলেছি—আজ পিসিমা বল্লেন, আপনার সাথে দেখা করে যেতে তাই……। কথা ক'টি শেষ করবার আগেই হেমন্তবাবু বল্লেন,—তুমি একটি কাজ করবে? আমার বড় কেরানীটি ছ'মাসের ছুটি নিচ্ছে—সে কাজটি এখন কত্তে পার…… তার পর যা……

জীবন একটু হেসে…… সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। হেমন্তবাবু আবার আরম্ভ করলেন—কিন্তু তোমাকে এ কাজে সর্ব্বদা রাখি সে ইচ্ছে আমার নেই……।

আমি আরও চেষ্টা করেছি, যদি পাই……। আচ্ছা আজ টুয়েন্টিএথ্ জুন, তুমি সেকেণ্ড জুলাই আমার সাথে দেখা করো।

এক ঝলক চাপা হাসি জীবনের সারা মুখখানির উপর বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় তাহার মাথাখানি আজ হেমন্তবাবুর দিকে দুইয়ে পড়লো। হাত জোড় করে নমস্কার করে বিদায় হলো।

রাস্তায় এসে জীবন বুক ফুলিয়ে হেটে চল্লো আজ যে তার কোন্ পুণ্য ফলে একাজটী পেয়ে গিয়েছে, সেটা ভগবানই জানেন। অন্যমনস্ক ভাবে হাত দুখানি জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে কপালে ঠেকালো। চলছে পথ বেয়ে, জীবন ভবিষ্যতের রঙিন সুখে বিভোর হয়ে।

সেকেণ্ড জুলাই—জীবন সকালে এক পেয়ালা চা টেনেই বেরিয়ে পড়লো হেমন্তবাবুর অফিসের দিকে—।

সেদিন জীবন সোজাসোজি হেমন্তবাবুকে নমস্কার ঠুকে ড্রইং রুমে ঢুকে পড়লো। জীবনকে দেখে কাগজের ফাইল-গুলি একধারে রেখে, বসো, বলে' একটি সিগারেট ধরিয়ে দু'ঠোঁট চেপে আবার কাগজের ফাইলটী টেনে নিয়ে খস খস করে একটির পর একটী পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন, এই যে জীবন, মোহিনীবাবুর টেম্ব জুলাই ছুটির দিন অতএব তুমি ঐ দিন আমার…। এমনি সময় একটী বিশ, বাইশ বছরের যুবা পর্দ্দা ঠেলে ঢুকলো—গায়ে একটি সিল্ক হাফ সার্ট, পায়ে দামী জুতা, চোখে চশমা, চুলগুলি সৌখিন ছাঁটা, মোটের উপর যুবাটী সুন্দর বটে। একটী খামে আটা চিঠি টেবিলের উপর রেখে বল্লে—'আমায় চিনবেন না, আমি ছোট পিসিমার ভাইপো, আমার নাম আশিষ চট্টোপাধ্যায়—কথা ক'টি একশ্বাসে বলে হেমন্তবাবুর পায়ের ধূলা নিয়ে দাড়ালো—।

হেমন্তবাবু বল্লেন, ও তুমি…।

হেমন্তবাবুর কথা শেষ হবার আগেই আশিষ আবার বলে উঠলো বাবা চিঠি দিয়ে পাঠালেন আপনার একটী ক্লার্ক নাকি ছুটি নিচ্ছে সে যায়গায়…। হেমন্তবাবু যেন চমকে উঠ্‌লেন, বল্লেন সে তো হয় না অনেক আগেই…এই দেখনা ওকে দেওয়া হয়ে গ্যাছে। তা'ছাড়া ছ'মাসের চাকুরি তুমি নিয়ে করবে কি? তোমার বাবার টাকার অভাব কি? জান? ওরা খুব গরীব খাওয়ার সংস্থানটুকু নেই…তোমাকে দিলে গরীব যে মরবে তিলে তিলে, তার খবর কি রাখ? আচ্ছা—ভেতরে পিসিমার সাথে দেখা করে আসি…বলেই পর্দ্দা ঠেলে বের হয়ে যায় আশিষ। হেমন্তবাবু চোখ তুলে বল্লে—দেখ জীবন—সেদিন খুব টাইমলী—এসে পড়ো বুঝলে? আজ্ঞে হাঁ, বলে জীবন চল্লো বাড়ীর পথে। জীবন ফুটপাথে পা ফেলে চলে বিজয় গর্ব্বে—সমস্ত জীবনের দুঃখ যেন কোন অজানা পুরীতে স্থান পেয়েছে, জীবন তার খোঁজ রাখে না। সেদিন সারারাত জীবনের ভাল ঘুম হয়নি—ভোরের ছেড়া ছেড়া ঘুমে জীবন স্বপ্নের রাজ্যে চলে যায়—সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে—ঘুমন্ত পুরার রাজকন্যাকে জাগায় রূপোর কাঠির স্পর্শে, মৃদু হেসে রাজকন্যা বলে এসেছ, তোমারই আশায়…। ঘুম ভেঙে যায় ভাবে সত্যিই যদি সে রাজা হয় বাস্তবে, তবে গরীব? গরীবকে দিবে বিলিয়ে মুঠো মুঠো টাকা, থাকবেনা কেউ গরীব। আর ধনী? করতে পারতো না ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব। জীবন আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ জীবনের চাকরীতে যোগ দেবার দিন সকালে খেয়ে চল্লো—ডালহৌসীর দিকে আজ তার চার আনা পয়সা খরচা কত্তেও আপত্তি নেই, কারণ টাইমলী পৌছতেই হবে। একটা রিক্সা ডেকে চেপে বসলো। রিক্সাওয়ালেকে জল্‌দি হাট—বলে কপালের ঘাম মুছে নেয়। যদি-ই টাইমলী না পৌছে…। কয়েক মিনিটের মধ্যে রিক্সা এসে যথাস্থানে পৌছলো। রিক্সাওয়ালার দাম চুকিয়ে চল্লো—হেমন্তবাবুর রুমের দিকে—।

হেমন্তবাবু জীবনকে দেখে হাঁফিয়ে উঠলেন, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝর ঝর করে পড়ছে। হেমন্তবাবুর ইচ্ছে করছিল আজ জীবনের কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু হায় তাও কি সম্ভব? না সে হবে না। ক্ষমা! আমি চাব সামান্য দরিদ্র যুবকের কাছে? কয়েক মুহুর্ত্তে হেমন্তবাবু চঞ্চল হয়ে ওঠেন, তিনি একজন বেঙ্কের মালিক হয়ে…। জীবন একটি কীট সমতুল্য…।

হঠাৎ সামনের টেবিলে প্রচণ্ড এক ঘুসি দিয়ে বল্লেন কিসের জন্য…চাকরী তাকুরী হবে না। বেরিয়ে যাও এক্ষুনি…।

জীবন কি একটা কথা বলতে যাওয়ায় হেমন্তবাবু বজ্রের মতো গর্জ্জে বল্লেন, ফের আমার কথার উপর কথা বলছো? দাঁড়াও দারোয়ান ডেকে দিচ্ছি মজা দেখিয়ে—বলেই কলিং বেল টিপে দিলেন।

জীবন হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লো জ্ঞানহীনভাবে। অস্ফুটভাবে বল্লে, বর্ব্বর দাম্ভিক এই তোমার দয়া…? এই তোমার দয়ার বিনিময়ে আজ আমার অপমান…। হঠাৎ একটা মালটানা মোটরের ধাক্কা খেয়ে জীবন সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লো লোহার মত কঠিন পিচের উপর…।

একটি পরিবার

শ্রীমতী বাণী দেবী

বন্ধু সাইমনকে দেখিতে যাইতেছিলাম। অনেক বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পূর্ব্বে সে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল; তাহার সহিত বহু দীর্ঘ সন্ধ্যা সুখে ও শান্তিতে কাটাইয়াছি। সে ছিল ঠিক সেই প্রকৃতির লোক যাহাকে হৃদয়ের অতি গূঢ় তথ্যও বলা যায়। সে যখন ধীরভাবে কথা বলিত তখন তাহার মধ্যে এক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, মৌলিকতা ও মার্জ্জিত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার বাকচাতুর্য্যে সকলেই উদ্দীপিত ও আকৃষ্ট হইয়া উঠিত। বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে নাই। আমরা একত্র বাস করিতাম, বেড়াইতাম, আমাদের চিন্তার এমন কি স্বপ্নের ধারাও যেন একই সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আমরা একই জিনিষ সমানভাবে ভালবাসিতাম, একই বইয়ের প্রশংসা করিতাম, একই রকম শিল্পের সমাদর করিতাম, একই অনুভূতিতে কণ্টকিত হইতাম এবং কেবলমাত্র একবার দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া, একই লোককে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ হাস্য করিতাম।

অবশেষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে এক গ্রাম্য বালিকাকে বিবাহ করিয়া বসিল। মেয়েটি স্বামী সন্ধানে প্যারিসে আসিয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য, অতি কৃশ হস্ত দুইটী, তাহার অর্থহীন হাল্‌কা দৃষ্টি, ভাব ও মাধুর্য্যবিহীন কণ্ঠস্বর লইয়া এই অতি সাধারণ পুস্তলিকাবৎ মেয়েটী কেমন করিয়া এই বুদ্ধিমান চতুর যুবককে আকৃষ্ট করিল ইহার অর্থ কেহ বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক সে যে এই সাদাসিধা-স্বভাবা বালিকার কোমল ভুজবন্ধনে স্থায়ী সুখ শান্তি ও সহজ জীবনযাত্রার কল্পনা করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যেন ঐ বালিকার সরল দৃষ্টির মধ্যেই এই সব দেখিতে পাইয়াছিল। বহির্জগতের প্রতি একেবারে উদাসীন না হইলে এক কর্ম্মঠ এবং প্রাণশক্তিতে স্পন্দমান পুরুষের এইরূপ অর্থ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনের বাস্তবতায় সহজেই যে ক্লান্তি আসিতে পারে সেকথা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহাকে গিয়া কিরূপ অবস্থায় দেখিব? এখনও সে রসিক প্রাণবন্ত, আমোদপ্রিয় ও উৎসাহী আছে? না, মফঃস্বলে জীবনযাপনে তাহার মনে ক্লান্তি আসিয়াছে? এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতেছিলাম। সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরে মানুষের স্বভাবের বহু পরিবর্ত্তনই হইতে পারে।

একটি ছোঁট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল, আমি গাড়ী হইতে নামিতেই এক অতি স্থূলকায় ব্যক্তি তাহার গোলাপী গাল ও প্রকাণ্ড ভুঁড়ি লইয়া 'জর্জ্জ' বলিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমিও তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। প্রথমে কিন্তু তাহাকে চিনিতেই পারি নাই। অবশেষে চিনিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"আরে তুমি ত একটুও রোগা হও নাই।" সে হাসিয়া বলিল—"তুমি কি আশা করিয়াছিলে? সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছি—ভাল খাওয়া এবং শান্তিময় নিদ্রাই এখন আমার জীবন।" আমি তাহার প্রতি নিবিষ্টভাবে

চাহিলাম, তাহার প্রশস্ত মুখের মধ্যে যে মুখ একদা অত্যন্ত ভালবাসিতাম, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিলাম। তাহার চক্ষু দুইটির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আর সেই পরিচিত দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে বলিলাম যদি চক্ষু দুইটী মনের দর্পণ হয় তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া বুঝিতে হইবে—যে সব চিন্তা তোমার মস্তিষ্কে সর্ব্বদা ঘুরিত যাহার অংশ কিছু কিছু আমি পাইয়াছি, তাহা এখন আর নাই। যাহা হউক তখনও তাহার চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল ছিল এবং তাহাতে বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছিল কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং যে দৃষ্টি ভাষা অপেক্ষা সুন্দর ভাব ও মনের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারিত সে দৃষ্টি ছিল না।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, এই দুটি আমার সন্তানদিগের মধ্যে বড়। দেখিলাম একটি পনের বৎসরের বালিকা, তাহার কৈশোর প্রায় অতিক্রম হইয়াছে এবং একটি তেরো বৎসরের বালক, তাহার পোষাকে দেখিয়া মনে হইল এই মাত্র যেন নাচের স্কুল হইতে আসিতেছে—ইহারা ইতস্ততঃ করিতে করিতে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার নিকট আসিল। তাহাদের দেখিয়া আমি নীচু গলায় প্রশ্ন করিলাম—ইহারা কি তোমার সন্তান? সে হাসিয়া উত্তর করিল—নিশ্চয়। কয়টি সন্তান হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতে বন্ধু বলিল—পাঁচটী, আরও তিনটী বাড়ীতে আছে। সে গর্ব্বিত, তৃপ্ত এবং যেন বিজয়ী বীরের মত রুণাগুলি বলিল, কিন্তু আমি এই অহেতুক গর্ব্বকারী পাড়াগেঁয়ে একঘেয়ে আনন্দে ক্ষীণ অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি নাই। গাড়ীতে উঠিলাম, সে নিজেই সহরের মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। সহরটি অতি সাধারণ ও ছোট, রাস্তায় বিশেষ লোকজন অথবা অন্য গাড়ী দেখিলাম না। কেবলমাত্র কয়েকটি কুকুর ও চাকরাণী চলাফিরা করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটি দোকান। দোকানের মালিকেরা টুপী খুলিয়া সাইমনকে অভিবাদন করিতেছিল। বন্ধু আমাকে তাহাদের নাম বলিয়া দিতেছিল। সে যে সহরের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিতেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। হঠাৎ আমার মনে হইল যে সে আইন সভার সভ্য হওয়ার চিন্তা করিতেছে, কারণ যাহারাই প্রাদেশিক জীবনযাত্রার মধ্যে ডুবিয়া থাকে তাহারা সকলেই এই স্বপ্ন দেখে। শীঘ্রই আমরা সহরের বাহিরে আসিলাম। গাড়ী একটি বাগানের দিকে চলিল এবং চূড়াওয়ালা একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। বাড়ীটি দেখিলে মনে হয় যেন কোন এক মনোহর প্রাসাদের অনুকরণ। সাইমন বলিল, "এইটি আমার আস্তানা।" তাহার কথার ধরণে মনে হইল যেন সে তাহার বাড়ীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ও যেন আমার নিকট হইতে প্রশংসা আদায় করিতেছে। কাজেই বাধ্য হইয়া বলিলাম "চমৎকার।" একটি মহিলা সিঁড়ির নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য লক্ষ্য করিবার মতন। বাড়ীতে অতিথি আসিবে একথা তাঁহার পূর্ব্বেই জানা ছিল এবং তাহার জন্য ঘটা করিয়া চুল বাঁধিয়াছেন আর কয়েকটী কথা মনে মনে আওড়াইতেছেন। পনেরো বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ শ্রীহীন দেখিয়াছিলাম এখন আর সেরূপ নাই। তাঁহার চুলগুলি বেশ একটু কোঁকড়া বলিয়া মনে হইল। এখন তাঁহাকে স্থূলাঙ্গী মহিলা বলা যাইতে পারে। তাঁহার বয়সও চেহারা দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। বুদ্ধির কোনরূপ ঔজ্জ্বল্য তাঁহার চেহারায় নাই। এক কথায় তিনি সন্তানের জননী। যেন একটা মেশিনের মত সন্তানের জন্ম দেওয়া, তাহাদের লালন পালন করা এবং খাতায় বাজার হিসাব লেখা ছাড়া অন্যদিকে মন দিবার অবসর তাহার নাই। আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া হল ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে তিনটি শিশু পর পর দাঁড়াইয়া আছে। যেন মেয়রের প্রতীক্ষায় ফায়ারম্যানদের সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। "ও এই যে আর তিনটি", বলিয়া তাহাদের দিকে চাহিলাম। সাইমন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বসিবার ঘরের পর্দ্দা খোলা ছিল, ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম এক অতি বৃদ্ধ লোক আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন। বৃদ্ধ কাঁপিতেছিলেন; বুঝিলাম তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়াছে: মাদাম র‍্যাডেভিশ বলিলেন—ইনি আমার পিতামহ। বয়স সাতাশী বৎসর হইয়াছে। বৃদ্ধের কানের কাছে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ঠাকুরদাদা, ইনি মাইকেলের বন্ধু।" বৃদ্ধ আমাকে অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া 'ওয়, ওয়' ছাড়া আর কোন

শব্দ বাহির হইল না। তিনি হাত দুটি নাড়িতে লাগিলেন। অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর দিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। সাইমন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"ঠাকুরদাদার সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে? বৃদ্ধ একটি অমূল্য রত্ন। ছেলেদের এক মজার বস্তু হইয়াছেন, খাওয়ার প্রতি এত লোভ হইয়াছে যে প্রত্যেকের খাওয়ার সময় নিজেকে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করেন। ইচ্ছামত খাবার জিনিষ পাইলে তিনি যে কি পরিমাণ খাইতে পারেন তাহা তুমি কল্পনায়ও করিতে পারিবে না। যাহা হউক সেসব একটু পরেই দেখিতে পাইবে। খাবার জিনিষের প্রতি এরূপ অদ্ভুতভাবে চাহিয়া থাকেন যেন সেগুলি স্ত্রীলোক! জীবনে এরূপ অদ্ভুত ও মজার জিনিষ নিশ্চয়ই কখনও দেখ নাই, একটু পরেই দেখিতে পাইবে।"

আমার জন্য যে ঘরটি ঠিক রাখা হইয়াছিল তাহা আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। নৈশ আহারের উপযুক্ত পোষাক পরিতে হইবে। পিছনে অনেকগুলি পায়ের খট্ খট্ শব্দ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি পিতার পশ্চাতে সব কয়টি পুত্রকন্যা আমাকে অনুসরণ করিতেছে। বোধ হয় আমারই সম্মানার্থে।

আমার ঘরের জানালা দিয়া বাহিরের সমতলক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল। বিস্তৃত মাঠ,—তাহাতে প্রচুর ঘন গম ও যবের গাছ; দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় ঘাসের সমুদ্র। যতদূর নজর চলে কোথাও একটী বৃক্ষ বা উঁচু জমি নাই, সবই যেন একই সুরে সাজান, কোথাও যেন বৈষম্য নাই, হঠাৎ বাহিরের এই দৃশ্যের সহিত ঘরের এই পরিবারের একটানা জীবনযাত্রার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম। নৈশ আহারের ঘণ্টা বাজিল। নীচে নামিয়া গেলাম। মিসেস র‍্যাডেভিশ যেন বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইতেছে সেইভাবে আমার হাত ধরিয়া খাইবার ঘরে লইয়া গেলেন। একজন ভৃত্য বৃদ্ধের চেয়ারটী ঠেলিয়া টেবিলের নিকট লইয়া আসিল। তিনি অতিকষ্টে কম্পিত মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এক এক করিয়া ফলের ডিসগুলি দেখিতে লাগিলেন। সাইমন দুই হাত ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "তোমার খুব মজা লাগিবে দেখিও।" ছেলেমেয়েরা সকলেই মনে করিল বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া আমিও তাহাদের মতই পুলকিত হইব। অতএব তাহারা যেন আরও বেশী হাসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মাও একটু হাসিয়া লইয়া বসিলেন। সাইমন দুই হাত জোড় করিয়া একটী বিউগলের মত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আজ পায়েস আছে।" শুনিয়া প্রথমে বৃদ্ধের কুঞ্চিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাহার পর তাহার আপাদ মস্তক অল্পে অল্পে, ভীষণ জোরে কাঁপিয়া উঠিল অর্থাৎ তিনি বুঝিয়াছেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। খাওয়া আরম্ভ হইল। সাইমন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "দেখ দেখ।" দেখিলাম বৃদ্ধ সুপ খাইতে পছন্দ করিতেছেন না কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের জন্য জোর করিয়া খাওয়ান হইতেছে। ভৃত্যটী চামচ করিয়া সুপ তাহার মুখে দিবামাত্র ফ্যুৎকার করিয়া সমস্ত মুখের সুপ সকলের গায়ে এবং টেবিলে ছিটাইয়া দিতেছেন। ছেলেরা এই দৃশ্যে পুলকিত হইয়া উঠিল; এবং তাহাদের পিতাও বলিলেন, "বড়া বড়ই মজার, না?" বৃদ্ধের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম তিনি যেন তাঁহার মন ও প্রাণের সমস্ত ব্যাকুল আগ্রহ দিয়া খাইতেছেন। চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন পারিলে চোখ দিয়াই সে সব গিলিয়া ফেলিবেন। কম্পিত হাত দুইটী দিয়া ডিসগুলি তিনি কাছে আনিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। ডিসগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নাগালের বাহিরে রাখা হইয়াছিল যেন তাহার ঐ বৃথা চেষ্টা দেখিবার জন্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের, মুখের, নাসিকার—যেন সমস্ত প্রকৃতির মিনতিপূর্ণ ব্যাকুল প্রার্থনা দেখিবার জন্যই। বৃদ্ধ ডিসগুলি ধরিতে না পারিয়া টেবিলের কাপড়ে লালা ফেলিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভীষণ ও কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত পরিবারের লোক হাসিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তারপর তাঁহার প্লেটের উপর এক টুকরা খাবার রাখা হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি ভীষণ পেটুকের মত উহা গিলিয়া ফেলিলেন যেন যত শীঘ্র ফুরাইবে ততই পাওয়া যাইবে। শেষকালে যখন পায়েস আসিল আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল এবং তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি অনেক খাইয়াছ তোমাকে আর দেওয়া হইবে না।" সকলেই এই ভাব দেখাইতে লাগিল, তাহাতে বৃদ্ধ প্রথমে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে ভীষণ জোরে কাঁপিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলে মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। যাহা হউক অবশেষ

তাঁহাকে অল্প একটু দেওয়া হইল। পায়েসটুকু মুখে নিতেই প্রথমে তাঁহার গলা দিয়া লোভীর মত এবং হাস্যকর একপ্রকার শব্দ বাহির হইল এবং তারপরে লোভীর মত আনন্দে হাঁসের মত ঘাড় দোলাইতে লাগিলেন। খাওয়া শেষ হইলে আরও পাইবার আশায় ছোট ছেলেদের মত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন। বৃদ্ধের এই হাস্যকর ও করুণ অবস্থা দেখিয়া করুণায় আর্দ্র হইলাম এবং তাহাকে আরও একটু দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম কিন্তু সাইমন বলিল, "না ভাই উনি অনেক খাইয়াছেন এই বৃদ্ধ বয়সে আর খাইলে অসুখ করিবে"। সাইমনের কথা শুনিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, এবং ভাবিলাম হায় নীতি-শাস্ত্র! হায়রে তর্কশাস্ত্র এবং হায়রে বিজ্ঞতা! বয়স!—তাঁহার যে বয়স এবং অবস্থা হইয়াছে এখনও তাঁহার জন্য শাস্ত্র মানিতে হইবে? আর ইহারা সেই শাস্ত্রের এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া তাঁহার একমাত্র অবশিষ্ট আনন্দ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেছে। তাঁহার স্বাস্থ্য?—আড়ষ্ট, কম্পমান, মানবজীবনের এক ভগ্নাবশেষ বৃদ্ধ, এই স্বাস্থ্য তাঁহার কি কাজে লাগিবে? পরিবারস্থ সকলে মনে করিতেছে তাঁহাকে যত্ন করা হইতেছে তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য। জীবন! তাঁহার জীবনের আর কয়দিন অবশিষ্ট আছে? দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ কিম্বা একশত দিন? কেন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা? তাঁহারই, জন্য না, সংসারে একটা হাসির বস্তু যতদিন ধরিয়া রাখা যায়, সেইজন্য?

এজীবনে তাঁহার কিছুই করিবার নাই। আর কিছুমাত্র নাই। তাঁহার একটী মাত্র আনন্দ বাঁচিয়া আছে এবং তাহাতেই তাঁহার সমস্ত আত্মার আনন্দ; তবে কেন তাঁহাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার শেষ সান্ত্বনা ও আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইবে না?

অনেকক্ষণ তাস খেলার পরে আমার ঘরে ঢুকিলাম। বিছানা পর্য্যন্ত গিয়া—ফিরিয়া জানালার উপর বসিলাম। আমার মন ও অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দূরে কোথায় যেন একটা পাখী ডাকিতেছিল—সেই মিষ্ট কূজন শুনিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন পক্ষীডিম্বের উপর নিদ্রিত পক্ষিনীকে ধীরে ধীরে ঘুম পাড়াণিয়া গান শুনাইতেছে; আমি আমার বন্ধুর পাঁচটী সন্তানের কথা ভাবিলাম ও মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলাম সে তাহার কদাকার স্ত্রীর পার্শ্বে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।*

সমাধি

শ্রীকমলা সেন

দুনিয়ার যেই ব্যথা ফেলিছে করুণ দীর্ঘশ্বাস
ব্যাপিয়া বসন্ত-বায়ু দিবানিশি করি' হা-হুতাশ,
এ সকল ব্যথা মাঝে আমার প্রাণের ব্যথাখানি
মূর্ত হ'য়ে উঠিয়াছে, লইবারে কাছে মোরে টানি।
অদৃশ্য বন্ধন-পাশে বেড়িয়া ধরিয়া চতুর্দ্দিকে,
মোর আশা, ভালোবাসা, ব্যথা মোর ব্যাপ্ত দিকে দিকে
ভুলিতে বুকের ব্যথা, ভুলিবারে সর্ব দুঃখ গ্লানি
সবারে আপন করি' সবারে হৃদয় পানে টানি—
একেলা চলিব না-কো, সাথে যাবে সকলের ব্যথা
আর যাবে অতীতের বিদায়ের তীব্র ব্যাকুলতা।

—তবু বারে বারে
আসিব যাইব চলি' দাঁড়াইব সে সীমার পারে
(যেথা) ব্যাকুলতা থাকিবেনা—রবেনা ক্রন্দন আর্তনাদ
আমার যাবার সাথে সর্বম্লান যাবে মোর সাথ।
তুমি শুধু রবে হেথা বসন্তের আনন্দের ডাকে
রাংগিয়া তুলিতে নিত্য নব স্বপ্ন আশার আলোকে
তৃপ্তিতে ভরিয়া আত্মখানি
যবে পোহাইবে যামি
রহিব তোমারে ঘিরে অনন্ত কালের একা 'আমি'।
—হাসিবে ধরণী অতি ধীরে
লুপ্ত হবে সর্বব্যথা আমার অঝোর অশ্রুনীরে।

---

* মোপাসাঁ হইতে।

কালিদাস ও প্রকৃতি

শ্রীমতী সন্ধ্যা ভাদুড়ী

সর্বকালে এবং সর্বযুগে প্রকৃতি কাব্যজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে! প্রকৃতিকে বাদ দিয়া নীতিকথা চলে, রাজনীতি চলে, ধর্মচর্চাও চলে, কিন্তু কাব্যকথা একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। প্রকৃতির স্থান কাব্যমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে কখন প্রকাশ্যে কখন বা নিভৃতে। পরম বিস্ময়ে কবি ও শিল্পী যুগ যুগ ধরিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। দেখিয়াছে সকলেই, মুগ্ধ হইয়াছেও সকলে, কিন্তু দেখিবার ভঙ্গীটি সকলের এক নয়। শেলীর প্রকৃতি তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ছাড়াইয়া কোন্ অদৃশ্য লোকের অভিনব সৌন্দর্য্য পুরীর সন্ধান পাইয়াছে, সেখানে অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সেখানে পার্থিব সমস্ত বস্তু অকিঞ্চিৎকর, অস্তিত্ব তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে শেলীর কাব্য-লোক রূপকথার দেশ! কালিদাসের প্রকৃতি এতখানি রহস্যের গুণ্ঠনে নিজেকে ঢাকে নাই। সে নিজে মায়াময়ী হইলেও ধরা দিতে তাহার বাধা নাই। স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কালিদাসের প্রকৃতি কি করিয়া যেন মানব-মনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লোকালয়ের বাহিরে তাহার গতিবিধি, সাধারণত লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিবার সম্ভাবনা কম; তবুও যখনই অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই মানুষ চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইয়াছে এই ক্ষণিক মিলনই বুঝি সম্পূর্ণ, আর ইহাকে বাদ দিয়া যাহা থাকে সে সবই অসম্পূর্ণ। কালিদাসের প্রকৃতির রূপটি একেবারে নূতন সংস্করণের। পূর্বতন কোনো সংস্করের ছাপ তাহাতে পড়ে নাই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি তাহার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একেবারে মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে, উপদেশ দিয়াছে, সময়ে অসময়ে নীতি-কথাও কহিয়াছে। কিন্তু কালি-দাসের প্রকৃতি অভিজাত বংশের, সাধারণের পর্যায়ে দাঁড়াইতে তাহার কোথায় যেন বাধে। কীটস্এর আসক্তি-প্রিয়তাও তাহার কোথাও দেখা যায় নাই। সর্বত্র সে প্রাণ-রসে উচ্ছলিত, কিন্তু আপন মহিমায় মহিমান্বিত। এই মহিমাই সংযমের রূপ ধরিয়া তাহাকে অনন্যা করিয়া তুলিয়াছে।

আকাশে মেঘ, কিন্তু পৃথিবীর কবি ভুলিয়া গেল যে মেঘ জমিয়াছে আকাশে। কালিদাস একটি অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিলেন "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি-চেতঃ।"

আকাশে মেঘ জমিয়াছে, এবং কাব্যলক্ষ্মীর দুয়ারে করাঘাত করিয়া সাড়াও তাহারা পাইয়াছে! কবিরা এই মেঘকে নিয়া বহু উচ্ছ্বসিত হইলেন, কিন্তু চরমে উঠিলেন কালিদাস। শুধু মেঘের রূপ বর্ণনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, একেবারে দূতরূপে তাহাকে অগ্রসর করাইয়া দিলেন অলকা-পুরীর পথে। তখন মনে রহিল না আকাশ আর মৃত্তিকার চির-ব্যবধান। অবশ্য পরে তিনি এই অসম্ভাব্যের সমর্থনও করিয়াছেন "কামার্ত্তা হি প্রকৃতি-কৃপণাশ্চেতনেষু।"

মেঘদূতের প্রকৃতির মধ্যে মানবীয়তার একটি সুস্পষ্ট ছাপ কোনক্রমেই অস্বীকার করিতে পারি না। দুইটি সর্গের মধ্যে যাহারা দৃষ্টি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারা সকলেই চেনা, সকলেই যেন আমাদের এই প্রতিদিনকার পরিচিত পৃথিবীর দুঃখ সুখের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। তাই যখন পড়ি রামগিরির কাছে বিদায় নিয়া মেঘ তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছে, তখন ধূমায়িত কালো মেঘের কথা বা রামগিরির কথা বেশী করিয়া মনে পড়ে না, বেশী করিয়া এই কথাটিই মনে পড়ে "কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য। স্নেহব্যক্তি শ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্।" তারপর যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে একে একে দেখা দেয় মেঘের সহচর সহচরীদের দল। জনপদবধূদের বিস্মিত দৃষ্টি পার হইয়া মেঘ চলিয়া আসে আম্রকূট পর্বতের কোলে। উপল-বিষম বিন্ধ্যের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা আসিয়া দেখা দিয়া যায়, পথ দেখাইতে আসে সারঙ্গের দল, শুক্লাপাঙ্গ ময়ূরীর দল আসিয়া স্বাগত-বচন

জানাইয়া যায়, আগমনের সংবাদে দশার্ণ নগরীর দশ দিকে শ্যাম সমারোহ পড়ে। তারপর আসে বেত্রবতী, বিদিশা নগরীর পর্বত কদম্ব-পুলকিত হইয়া ওঠে। কুসুম-চয়ন-কারিণীদের আনন ছায়াস্নিগ্ধ করিয়া উজ্জয়িনী-বিলাসিনীদের চঞ্চল কটাক্ষের সাড়া দিয়া নির্বিন্ধ্যার বিরহাশ্রু মুছাইয়া উজ্জয়িনীর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দুয়ারে আসিয়া মেঘ দাঁড়ায়। সেখানে মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যা-বলি-পটহের ধ্বনি তাহার কণ্ঠে মথিত হইয়া ওঠে। বিদ্যুৎ-প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়া ভবন-বলভির উপর রাত কাটিয়া যায়। আবার প্রভাতে যাত্রা সুরু। সূর্য্যদেব নলিনীর মুখের উপর হইতে হিমাশ্রু মুছাইতে ব্যস্ত। মেঘ চলে। আবার আসে গম্ভীরা, দেবগিরি, ধরিত্রীর কণ্ঠদেশে মুক্তামালার মত আসে চর্মন্বতী, আসে সরস্বতী। শম্ভুর জটাজাল আকর্ষণ করিয়া জাহ্নবী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। হিমাদ্রির তট-প্রান্ত অতিক্রম করিয়া কৈলাসের অতিথিরূপে মেঘ আসিয়া দাঁড়ায়। সেখানে হরগৌরীর ক্রীড়াশৈলের সোপান-শ্রেণী রচনা করিয়া স্বর্ণ-কমল-মানসের তীর্থবারি পান করিয়া তারপর স্রস্ত-গঙ্গা-দুকূলা অলকা চোখে পড়ে—যক্ষের অলকা। এই অলকাকে সামনে রাখিয়া পূর্বমেঘ অন্তর্ধান করিয়াছে, তারপর উত্তরমেঘ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উত্তর মেঘে অলকার ছবি যক্ষের গৃহছবি, এবং তাহার প্রিয়ার ছবি সারি সারি আঁকা হইয়াছে। তারপর যক্ষের নিবেদিত-বার্তার নিবেদন-শেষে মেঘের প্রতি কল্যাণের একটী শুভ আশিসের বাণী যক্ষের মুখে জানাইয়া কবি মেঘদূত কাব্য শেষ করিয়াছেন। উত্তর খণ্ডে সমস্তই বর্ণনা-বহুল। কিন্তু সে বর্ণনাও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অলকা-বধূদের প্রসাধন ভাণ্ড ভরিয়াছে প্রকৃতির দানে। তাই তাহাদের "হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং, নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ। চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং।"

অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে যক্ষ-বধূকে যখন মেঘ তাহার সজলকণিকায় আশ্বাসিত করিয়া শুনিত বচনে তাহাকে প্রিয়ের বার্তা শোনাইবে, তখনকার ছবিটি মনে একটি দাগ আঁকিয়া যায়। এমন স-জীবন এমন প্রাণবন্ত প্রকৃতি আর কোথাও বোধ হয় চোখে পড়ে নাই। তারপর শেষের দিকের সেই শ্লোকটি "ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষাসম্ভৃতশ্রীর্ধাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ", কি যেন অনির্বচনীয় ভাবের আবেগে মনকে আপ্লুত করিয়া দেয়। মনে হয় এমন করিয়া প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানব-হৃদয়ের চিরন্তন রহস্যলোকের দ্বারটিত উদ্ঘাটন করিতে কি কেউ কোনদিন পারিয়াছে? এ কেবল কালিদাসের লেখনীই পারিয়াছিল।

মেঘদূতের পর প্রকৃতির আরও পরিচয় পাওয়া যায় ঋতু-সংহারে। এ পরিচয় অবগুণ্ঠনের আড়ালে রহস্যময় শুভদৃষ্টির পরিচয় নয়, এ দিনের আলোয় মুখোমুখি দেখা। এখানকার প্রকৃতি অতি স্পষ্ট স্থূল, প্রত্যক্ষ-লোকের মধ্যেই তাহার আসা যাওয়া। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুর রূপ—যে রূপ চোখ ভরিয়া সামনে জাগে, তাহাই কবি দেখাইয়াছেন। শরৎ বর্ণনার প্রথম শ্লোকটি যেন মূর্তিমতী শারদলক্ষ্মী। "কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা, সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা। আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ, প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা।"

কাশ অংশুক, আননে কমল, কলহংসের নূপুর বাজে,
পক্কধানের মত দেহলতা শরৎ এসেছে বধূর সাজে।

ঋতু-সংহারের কাব্যমাধুর্য কালিদাসের পরবর্তী কাব্যগুলির সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হইয়া আসিয়াছে অনেকে বলেন, কিন্তু প্রকৃতির এমন প্রকৃত প্রতিবিম্ব ঋতু-সংহারেই সম্ভব হইয়াছিল। বসন্তের বনে বনে যে রঙের আগুন জ্বলিয়াছে ঠিক সেই বর্ণ-সমারোহই ফুটিয়া উঠিয়াছে বসন্ত-বর্ণনায়। আদীপ্ত-বহ্নিসদৃশৈর্ব্যরুতাবধূতৈঃ, সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ। সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি, রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমি।"

সুদ্দীপ্ত বহ্নির মত পুষ্পনত আন্দোলিত কিংশুক-বনে
বসন্ত এসেছে যবে রক্তবাসে নববধূ জাগে সেই ক্ষণে।

কালিদাসের দুইটি মহাকাব্য রঘুবংশ এবং কুমারসম্ভবও প্রকৃতি ছাড়া নয়। রঘুবংশের নবম সর্গে বসন্ত নামিয়া আসিয়াছে দশরথকে সেবা করিবার জন্য। সেখানে "অলিতি-রঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমসংস্তিনিপাতিতরঙ্কিতঃ। ন খলু শোভয়তিস্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব।"

কুসুম-ঝরানো অলি সে অঞ্জনে তনু বিভূষিত,
তিলক বৃক্ষেরা করে বনানীরে সৌন্দর্য-মণ্ডিত।

রঘুবংশের প্রকৃতির মধ্যেও কবি প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন। যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদের বিনাশের জন্য রাম ও লক্ষ্মণ যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলিলেন তখন,

তৌ সরাংসি রসবদ্ভিরম্বুভিঃ কৃজিতৈঃ শ্রুতিসুখৈঃ পতত্রিণঃ।
বায়ব স্তুরভিপুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়াচ জলদা সিষেবিরে॥"

সেবা করে সরোবর স্নিগ্ধজলে, বিহগ কুজনে
মেঘমালা ছায়া ফেলে পুষ্পরেণু ঝরে সমীরণে।

শুধু প্রাণের সঞ্চার করিয়াই কবি ক্ষান্ত হ'ন নাই। বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে তিনি একটি আন্তরিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন—তাই তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি কখন চঞ্চল কখন গম্ভীর। কখনও সে আপনার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাই অত্রির তপোবনের 'পরম প্রশান্তির মধ্যে প্রকৃতির রূপটিও বড় সমাহিত। সেখানে,

"বীরাসনৈর্ধ্যানযুযামুষীণামমী সমাধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।
নির্বাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি॥
বীরাসনা মুনিদের বৃক্ষরাজি বেদিমধ্য থেকে
নির্বাত নিষ্কম্প, যেন যোগমগ্ন, মনে হয় দেখে।

কখনও প্রকৃতি মানব-মনের বিষণ্ণতায় যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদ শ্রী। তাই আপনার অন্তর্ষন ভাবের আবেগে রামচন্দ্র মাল্যবান গিরিকেও দেখিলেন অশ্রুময় "এতদ্দিদৃক্ষোর্মাল্যবতঃ পুরস্তা-দাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্। নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্নয়দ্ভ চ তদ্বি-প্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্।" মাল্যবান্ পর্বতের নভস্পর্শী শৃঙ্গ দেখা যায়।

যেথা মেঘ ঢালে জল, আমি কাঁদি এক সাথে হায়।

কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে তপোবনের মধ্যে বসন্তের আগমন কবির অভিনব সৃষ্টি। আত্মভোলা মহেশ্বরের ধ্যান ভাঙাইতে বসন্ত উপস্থিত হইয়াছে। বনস্থলীর কোণে কোণে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 'অশোক' হাসিয়াছে, 'কর্ণিকারের' রঙের সমারোহে সৌরভ-হীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, অর্ধ বিকসিত রক্তপলাশ বনের একপ্রান্তে চন্দ্রলেখার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। বসন্ত-লক্ষ্মীর নয়নে ভ্রমরদল আসিয়া অঞ্জন-রেখা আঁকিয়া দিয়াছে, তিলক-পুষ্প আননে চিত্র-লেখা রচনা করিয়াছে, চূত-প্রবালে ওষ্ঠ রঞ্জিত হইয়াছে। মর্মরিত বনপথ কুহুধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর আবেষ্টনী সার্থক হইয়া উঠিল যখন সে পটভূমিকার পারে আসিয়া দাঁড়াইলেন উমা "পর্ণাপুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" মানবীয় গুণের এমন ব্যাপকতা কালিদাসই অনুভব করিয়াছিলেন মর্মে মর্মে। তাই তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি মানবী হইয়া উঠিয়াছে প্রহেলিকা হইয়া ওঠে নাই।

শকুন্তলায় প্রকৃতির রূপটি অনন্য-সাধারণ। এখানে প্রকৃতির বহিরাবরণের তলে যে অন্তর্লোকটি কবি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই মর্মস্পর্শী। শকুন্তলার জীবন প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। প্রকৃতির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে গেলে সে যেন সম্পূর্ণ হয় না। এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্তই বলিয়াছেন: "অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।"

কালিদাসের প্রকৃতি কালিদাসেরই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে। যে দৃষ্টি দিয়া তিনি প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন সে তাঁহারই নিজস্ব দৃষ্টি। সে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে প্রকৃতি অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার এমন গভীর সহানুভূতি ছিল বলিয়াই দেখিয়াছিলেন প্রকৃতির সর্বত্র প্রাণমমতার স্রোতধারা।

ঋতু সংহারে কালিদাস

সুকুমারী দত্ত

(১)

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথমদিকের রচনা। কালিদাস-সাহিত্যের বিবর্তনে এ-অধ্যায়টি নিজের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত নয়—কবির প্রতিভা বিকাশের অঙ্কুর বলিয়াই ইহার মূল্য। ভাবে, ভাষায়, রুচিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে—সবদিকেই এ-কাব্যে তারুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। তবু ভবিষ্যতের মহাকবিকে এ-কাব্যের মধ্যে চিনিয়া লওয়াও কঠিন নয়।

ছয়টি ঋতুর আনুপূর্বিক বর্ণনাই এ-কাব্যের উপজীব্য; কোনও কবি তাঁহার প্রিয়ার নিকট ছয় ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ বর্ণনা করিতেছেন। আকৃতিক বিচারে ঋতু-সংহার খণ্ডকাব্য—প্রকৃতিতে ইহা কয়েকটি অসংবদ্ধ কাব্য-খণ্ডের সমষ্টিমাত্র। মেঘদূতও খণ্ডকাব্য, তবু মেঘদূতের মধ্যে কাব্যের একটা চমৎকার ধারাবাহিক পরিণতি আছে, কিন্তু ঋতুসংহারে তেমন কিছু নাই। শুধু যে ছয়টি ঋতুর পৃথক্ বর্ণনার জন্যই এ অসংগতি, তা নয়; প্রত্যেকটি ঋতুর বর্ণনাতেও কোনও ক্রম বা পরিণতি নাই। 'পুষ্পবাণ-বিলাস' বা 'শৃঙ্গার-রসাষ্টক' যেমন কোনও হীন কবির বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শ্লোকের যথেচ্ছ সমষ্টি, অন্তরের কোনও যোগসূত্র তাহাতে নাই,—ঋতুসংহারও তেমনি কয়েকটি বিশ্লিষ্ট কাব্যকণিকার একটি সংগ্রথিত আকৃতি মাত্র। তবু ঋতুসংহারের এই অসংবদ্ধ রূপের পশ্চাতে একটি বিকাশোন্মুখ কবি মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাই ঋতুসংহার প্রথম শ্রেণীর কাব্য না হইলেও পুষ্পবাণ-বিলাসের মত হীনকাব্য নয়। ঋতু-সংহারের যে অসংহতি তাহার কারণ তরুণ কবির অসংযম। তাঁহার বর্ণনা কোথাও বস্তুনিষ্ঠ, কোথাও ব্যক্তিনিষ্ঠ। কখনও বা তিনি অসংযত সমারোহে প্রকৃতির বাহিরের রূপ বর্ণনা করিতেছেন আবার কোথাও বা সেই রূপ মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া আনে তাহাই উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। কিন্তু এ-সকল সত্ত্বেও মেঘদূত রসোত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর রচনা; সেখানেও প্রকৃতির সহিত যক্ষের বিরহ, যক্ষবধূর বিরহ পাশাপাশি রূপ পাইয়াছে তথাপি রসভঙ্গ হয় নাই। তাহার কারণ, মেঘদূতের মধ্যে রসের একটি অন্তর্নিহিত ধারাবাহিকতা আছে: বস্তুলীন বর্ণনার মধ্যেও মেঘদূত অন্তর্মুখী; সমস্ত চিত্রের উপরে যক্ষের বিরহ একটা স্বপ্ননীলিমার মায়াজাল বিছাইয়া রাখিয়াছে। ঋতুসংহারে এমন কোনও ভাবের ঐক্য নাই; অথচ অনায়াসেই থাকিতে পারিত। প্রথম শ্লোকেই কবি সুরু করিয়াছেন,—নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে; 'প্রিয়ে, ঐ গ্রীষ্ম আসিল'।—কবির মনের কোনও একটা স্থায়ী ভাব দিয়া বর্ণনা করিলে একাব্যেও সুসংহত হইতে পারিত; কিন্তু ভীরু কবি মনকে এত নেপথ্যে রাখিয়াছেন যে বর্ণনা বহির্মুখী হইয়াছে। কচিৎ কখনও বিরহের নীলাঞ্জন ছায়া দেখা দিয়াছে, কখনও বা মিলনের রক্তিমা লাগিয়াছে চিত্রের উপরে; কিন্তু সে নিতান্তই ক্ষণিক।

সমস্ত কাব্যটি প্রিয়ার নিকট প্রেমিকের উক্তি, অথচ প্রিয়াই একাব্যে সবচেয়ে অবান্তর! প্রিয়ার স্থানে যে-কোনও লোক থাকিতে পারিত, এমন কি, কেহ না থাকিলেও কোনও ক্ষতি হইত না। 'শ্রুতবোধে' কবি ছন্দের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন প্রিয়ার নিকট, কিন্তু সেখানেও প্রিয়া পাদপূরণের প্রয়োজনে আসিয়াছেন কাব্যের প্রয়োজনে নয়।—ঋতু-সংহারের প্রিয়াও স্বর্গগীতার মতই নিষ্প্রাণ, তাই তাঁহাকে সম্বোধন করিবার সময়ে কবির কণ্ঠে কোনও আবেগের সুর ধ্বনিত হয় নাই। নিতান্ত নির্ব্যক্তিক ভঙ্গীর বর্ণনার মধ্যে এ প্রিয়ার অবতারণা দেখিলে মনে হয় কবির জীবনে প্রেম আসিবার পূর্বেই এই প্রিয়া আসিয়াছিলেন।—শুধু কাব্যেই তাঁহার স্থান। মনে পড়ে প্রিয়ার নিকট প্রকৃতি বর্ণনা কবি আরও পরিণত বয়সের রচনায় আর একবার করিয়াছিলেন,—কুমারসম্ভবের অষ্টম-সর্গে। এই সর্গটি কালিদাসের রচনা কিনা সে-বিষয়ে

মতদ্বৈধ আছে; সে-প্রশ্ন না তুলিয়া বলা যায় এখানে মলয় পর্বতে শঙ্কর গৌরীর কাছে যে প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনুরাগের রক্তিমা আছে,—প্রকৃতির উপরে একটি প্রেমিক হৃদয়ের চেতনা প্রসারিত হইয়াছে, তাই সে বর্ণনা এত প্রাণময়। নবমিলনের দৃষ্টিতে শঙ্কর প্রকৃতিকে দেখিতেছেন, তাঁহার চেতনায় সবচেয়ে প্রত্যক্ষ গৌরী, তাই তাঁহার বর্ণনাতেও সবচেয়ে মাধুর্য-রসে। প্রকৃতি ত চিরকাল ছিল, থাকিবেও,—কবির চক্ষে তাহাতে সহসা প্রাণ-সঞ্চার করিল একটি নারী। নায়কের পৃথিবীতে প্রাণপ্রতিমা এই নায়িকা,—তাই—শঙ্করের প্রকৃতি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় উমাকে, অনুভব করা যায় তাঁহার প্রেমের আবেগ স্পন্দন।.....সন্ধ্যার অন্ধকার মলয় পর্বতে গাঢ় হইয়া আসিবার পূর্বেই দেখা দিল পূর্ণিমার চাঁদ;—জলস্থল আলোতে হাসিয়া উঠিল। শঙ্কর উমার কাছে সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছেন,—"গৌরি, ঐ দেখ তরু শাখার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অরণ্যভূমিতে লুটাইতেছে, মনে হয় যেন অজস্র শুভ্র কুসুম স্তবকে স্তবকে ঝরিয়া তরুতলে পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে, যেন হাত বাড়াইলেই চয়ন করা যায়, এমন কি তোমার অলকে সাজাইয়াও দেওয়া যায়।" (কুমার ৮।৭৩) এ বর্ণনায় গৌরী উপেক্ষিতা নন্ বরং প্রকৃতির এই যে রূপ শঙ্করের চোখে পড়িয়াছে সে-যেন গৌরী পাশে আছেন বলিয়াই।.....রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গে রামচন্দ্র সীতার কাছে যে সমুদ্রবর্ণনা করিয়াছেন সে-ও এমনি প্রাণের রঙে রঙীণ। ঋতুসংহারে কবি প্রকৃতিকে বাহির হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রিয়াকে সম্বোধন করার ফলে রসদ্বৈত দোষ হইয়াছে; উদ্ভূত অনুভূতিকে রুদ্ধ করিয়া নির্ব্যক্তিক সুরে কবি প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

(২)

কিন্তু ঋতুসংহার কালিদাসকে প্রকাশ করিয়াছে। যে কবি একদিন কুমারের তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বর্ণনা করিবেন, মেঘদূতে বর্ষার বর্ণনা করিবেন তাঁহাকে একাব্যে চিনিতে পারা যায়। গ্রীষ্মের বর্ণনাতে যে-চিত্রটি ফুটিয়াছে তাহাতে ভীরু তুলিকার অস্পষ্ট রেখার মধ্যেও একটি প্রচণ্ড রুক্ষতার শিখা স্পষ্ট দেখা যায়। একটি কবিমন গ্রীষ্মের ও তাপ-দগ্ধ প্রকৃতির দিকে চোখ মেলিয়া দেখিলে যে-রূপটি ধরা পড়ে ঋতুসংহার সেই ছবি। এখানে অনুভূতির বিন্দুমাত্র আভাস নাই, বস্তুলীন বর্ণনার মধ্যে কবি সম্পূর্ণ নেপথ্যে থাকিয়া গ্রীষ্মকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।".....গজ-যূথ স্নানের উৎসাহে মৃণাল ছিঁড়িয়া সরোবরের জল আন্দোলিত করিতেছে, সারসেরা সভয়ে ইতস্তত: পালাইতেছে, সরোবরে শুধু হস্তীর আবক্ষ কর্দম। জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ক্লান্ত সর্প ঘনঘন নিঃশ্বাস লইতেছে; ফণার নীচেই ভেক—সেদিকে কোনও লক্ষ্য নাই,—প্রখর সূর্যকিরণে মণিটি জ্বলিতেছে।...দাবানলে সমস্ত অরণ্য দগ্ধ, তপ্ত বাতাসে শুষ্ক পাতা দিকে দিকে উড়িতেছে। সমস্ত জলস্রোত নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। ...পত্রহীন গাছের নীচে শীর্ণ পাতার উপরে রৌদ্রক্লিষ্ট পাখী-গুলি বসিয়া আছে।...আগুনে চারিদিক পুড়িয়া যাইতেছে, প্রবল বাতাসে সে আগুন যেন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সদ্যোবিকচ কুসুমমূলের রক্ত প্রভার মত গাঢ় রক্তবর্ণ শিখায় উজ্জ্বল অগ্নি যেন তীব্র আবেগে লতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। ...দেখিতে দেখিতে শ্যামকান্তি বনানী রুক্ষ প্রান্তর হইয়া গেল। ব্যাকুল চকিত মৃগকুল প্রাণভয়ে ছুটিতেছে, উন্নতশিখর তরু-গুলির শীর্ষশাখায় তখনও দাবানলের উন্মাদ নৃত্য চলিতেছে। ..."(গ্রীষ্মবর্ণনম্; ১৯—২৬) এ ছবি সম্পূর্ণ বাহিরের প্রকৃতির যে-রূপ চিত্রকরের চোখে পড়ে এ সেই রূপ। অলঙ্কারের আতিশয্য নাই, কল্পনারও প্রসার নাই শুধু যথাযথ বর্ণনাতেই কবি অসামান্য নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ষাবর্ণনায় কালিদাস—অনেকটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বর্ষার ঐশ্বর্য্য তাঁহার দৃষ্টিতে দিগ্বিজয়ী রাজার রূপে দেখা দিয়াছে। প্রথমেই বলিয়াছেন,

> সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ পতাকোঽশনিশব্দ মর্দলঃ।
> সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে। (১)

'প্রিয়ে, দেখ, প্রেমিকের প্রিয় বর্ষা আসিয়াছে। জল-কণাবর্ষী জলধর রাজার মদবর্ষী রণমাতঙ্গের মত, বিদ্যুল্লতা দিগ্বিজয়ীর জয়পতাকা, আর গম্ভীর মেঘধ্বনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজার জয়ডঙ্কের নিনাদের মত।'

কিন্তু এই বর্ষার আরও একটা দিক কবির চোখে ধরা পড়িয়াছে। একদিকে যেমন বর্ষা প্রেমিকের প্রিয়, অন্যদিকে তেমনই বিরহীর হৃদয়বেদনা। বর্ষার বর্ণনায় একদিকে তাই মিলনের উজ্জ্বল চিত্র,—অন্যদিকে বিরহীর দীর্ঘশ্বাস। যে কবি উত্তরকালে মেঘদূত লিখিবেন, তিনি যে বর্ষার এই দিকটি হৃদয় দিয়া অনুভব করিবেন ইহা আশ্চর্য নয়। তাই এদিকে আছে

অভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্ব্বরীষপি।
তড়িৎপ্রভা-দর্শিত-মার্গভূময়ঃ প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
(বর্ষাবর্ণনম্)

"অবিশ্রান্ত মেঘধ্বনিতে অন্তরীক্ষ মুখরিত করিয়া মেঘরাশি রজনীর অন্ধকার বাড়াইয়া দিয়াছে,—পথঘাট কিছুই দেখা যায় না; তবু, এমন তামসী রজনীতেও অভিসারিকা বিদ্যুতের আলোতে কোনওমতে পথ চলিতেছে।" মনে পড়ে রতি-বিলাপের সেই শ্লোক—

রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দ বিক্লবাঃ।
স্মরতি স্ত্রিয় ! কামিনাং স্ত্রিয়াবধৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ।
(কুমার ৪।১১০)

'সূচীভেদ্য অন্ধকারে যখন পথ দেখা যায় না, তখন, মেঘগর্জনে চকিতচিত্ত অভিসারিকাকে তুমি ছাড়া আর কে পথ দেখাইবে, হে মীনকেতু — ?'

এ কবির পরিণত কবিমনের অভিব্যক্তি। বর্ষাভিসারে পথ চলে যে নারী বিদ্যুৎ তাহাকে পথ দেখায় না,—প্রেম,—পুষ্পধনু মদন স্বয়ং—তাহাকে পথ দেখায়। বর্ষাবর্ণনায় আছে তরুণ কবির ভাবোজ্জ্বল মনের পরিচয়। এমন মেঘনিবিড় রাত্রে প্রেম দূরকে নিকট করিয়া দেয়, তাই রাত্রির অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া, মেঘের ঘনঘটাকে তুচ্ছ করিয়া অজানা পথে অভিসারিকা বাহির হইয়া পড়ে। মেঘদূতেও এ-ভাবের প্রতিধ্বনি আছে। ... এই যে বর্ষারজনীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু কালিদাসের কবি মনে ইহা সাড়া জাগাইয়াছিল। তাই এক-দিকে যেমন তিনি মিলনোৎসুক—হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়াছেন অন্যদিকে খণ্ডিতা বিরহিনীর বেদনাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তাই—

"প্রোষিতভর্তৃকা নারী কি দুঃসহ নৈরাশ্যে এই বর্ষারাত্রি যাপন করে! কমলের মত দুটি নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, আঁখিপল্লব সিক্ত হইয়া যায় সে অশ্রুতে, মাল্যচন্দনের সমস্ত প্রসাধন দূরে পড়িয়া থাকে। দূরগত প্রিয়ের চিন্তায় সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। এ ভাব উত্তর মেঘের অগ্রদূত। বর্ষার মধ্যে বিরহের এই যে অব্যক্ত ইঙ্গিত ইহাতে কবির মন দুলিয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই তিনি অসাধারণ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে অনির্দেশ্য আবেগ বর্ষার সমীরণে দূরের দীর্ঘশ্বাসের সন্ধান দিয়া প্রিয়বিরহিতকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, সেই কোমল অনুভূতির উপরেই মেঘ-দূতের প্রতিষ্ঠা,—সেই অনুভূতির প্রবণতা ঋতুসংহারের বর্ষা-বর্ণনাতেও চোখ পড়ে।

(৩)

ঋতুসংহারে স্থূলতা অনেক। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরূপ সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয়ই কবির ভবিষ্যৎ সূচিত করে। রুচির দোষই এ কাব্যের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। যে-কবি শকুন্তলার মত কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচনায় এত বেশী স্থূলতা সহসা বিস্ময় জাগায়। কিন্তু ঋতুসংহার কবির অপরিণত রচনা। —অনেক দোষ-ত্রুটি কুরুচি-গ্লানির কলঙ্ক ধুইয়া মুছিয়া দীর্ঘ পথের প্রান্তে একদিন শকুন্তলার সৃষ্টি হইল। ঋতুসংহারে রবি যেমন প্রকৃতিকে বাহির হইতে দেখিয়াছেন। তেমনি নারীকেও বাহির হইতে দেখিয়াছেন। এখানে তাঁহার যে-দৃষ্টি তাহাতে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত রচনা করা চলে,—যেখানে শুধু রূপ, শুধু উচ্ছলতা। এ বহিঃ সুষমার যে চিত্র এত স্থূল, প্রাণের মাধুর্যে এত বঞ্চিত যে তাহার রসে গ্লানি বড় বেশী, তাহার সুস্থতার অভাব রুচির দৈন্য বড় পীড়া দেয়। যুগের প্রভাব স্বীকার করিয়াও বলিব আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবে এ কাব্য রসোত্তীর্ণ হইতে পায় নাই। হেমন্ত ও শীতের বর্ণনার মধ্যে ঋতুবর্ণনা গৌণ, নর-নারীই প্রধান। মেঘদূতেও প্রকৃতির চিত্রের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বহুদূর দেশে দুটি চিত্ত পরস্পরের উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে। অতৃপ্ত নয়নে নিমিষেমেষে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে; —তাহাদের সেই অনিমেষ চাহিয়া থাকা, সেই ব্যথা দীর্ঘ অন্তরের দীর্ঘশ্বাসই কাব্যের প্রাণ। পূর্বমেঘে দেখা গেল রামগিরিতে যক্ষ উৎসুকনেত্রে চাহিয়া আছে দূর অলকার প্রিয়ার দিকে; উত্তরমেঘে দেখা গেল অলকার যক্ষবধূ সুদূর রামগিরির দিকে বদ্ধদৃষ্টি। বর্ষার প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এই দুটি বিরহব্যথিত প্রাণের আকুল প্রতীক্ষা। অনুভূতির এই তীব্রতাই মেঘদূতকে অমর করিয়াছে। এই অনুভূতির অভাবেই ঋতুসংহার প্রথম শ্রেণীর কাব্য হইতে পায় নাই। ঋতুসংহার দেহধর্মী, কাব্যের আত্মা যে-রস, তাহা একাব্যে নিবিড় হইয়া উঠে নাই। ইতস্ততঃ আভাস আছে, কোথাও কোথাও দু'একটি শ্লোক অনু-ভূতিতে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সে ব্যতিক্রম,—ভীরু কবি যেন মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন নির্ব্যক্তিক প্রকৃতি বর্ণনায়। অথচ এই প্রকৃতিবর্ণনায় একটু আবেগের মাধুরী স্পর্শ করিলে তাহা যথার্থ কাব্য হইয়া উঠিত।

কালিদাসের কালের দিগন্ত হইতে আমরা কয়েক শতাব্দী দূরে সরিয়া আসিয়াছি; তাঁহার সমাজ, তাঁহার কালের সাহিত্য আজ শুধু আমাদের কল্পনায়, অনুমানে আছে। এতদূরে থাকিয়া আজ হয়ত তাঁহার যুগের চিত্রকে নিঃসংশয়ে রুচিদুষ্ট বলা চলে না। তবু যখন বলি ঋতুসংহারে রুচির বিকার আছে তখন কবির অন্য রচনার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া বলি। যে-কবি দেহকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যিনি শকুন্তলাকে তৃতীয় হইতে সপ্তম অঙ্কে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার লেখনী হইতে যখন নারীর শুধু বাহিরের রূপের চিত্র পাই তখন রসবোধ আহত হয়। কে জানে, উদীয়মান তরুণ কবি যুগের মন রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা! হয়ত এ তাঁহার তারুণ্যের উচ্ছলতা, হয়ত বিস্ময় কৌতূহলের মিশ্র সৃষ্টি আবার হয়ত-বা অপরিণত মনের ভীরু গতানুগতিকতা।

ঋতুসংহারের শ্রেষ্ঠ বর্ণনা শরৎ। এই ঋতুটিকে কবি যেন বিস্ময়মুগ্ধ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাই একদিকে যেমন যেমন রুচির দোষ স্পর্শ করে নাই, অন্যদিকে তেমনি ছাব্বিশটি শ্লোকে শরতের একটি সম্পূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরতের প্রকৃতিতে চতুর্দিকে একটা স্নিগ্ধ শান্তি, গভীর তৃপ্তি ও অম্লান শুভ্রতা। এই শুভ্রতার মহিমায় শরৎ স্বর্গের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে মর্ত লোকে। শরৎ যেন নববধূর কল্যাণলক্ষ্মী মূর্তি,—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা মোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরদ্বরবধূরিব রূপরম্যা।
কাশৈর্মহী শিশিরশীথিতনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং
কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারগতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ
মালতীভিঃ॥ (শরদ্বর্ণনম্ ১।২

"শরৎ যেন চারুকান্তি একটি নববধূ। কাশকুসুমের রাশিতে তাহার বসন, বিকচকমলের মাধুর্যে তাহার মুখ, হংসরবে তাহার নূপুর ধ্বনি। শরতে কাশফুলে পৃথিবী শুভ্রতা পাইয়াছে। জ্যোৎস্নায় রাত্রি শ্বেতসুন্দর হইয়াছে। হংসে জল; কুমুদে সরোবর, সপ্তপর্ণের আস্তরণে অরণ্য, ও মালতীর সমারোহে উপবন শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে।" জলস্থলের এই যে দিগ্‌ব্যাপিনী শুভ্র মাধুরী ইহার মধ্যে শুচিতার ও মহিমার একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত গোপন রহিয়াছে। এইটুকুই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য। শরতের প্রসঙ্গেও বিরহমিলনের কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে যেন কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। প্রবাসী প্রিয়ের চিত্তে শরৎকাল বিভ্রম আনিয়া দেয়,—প্রকৃতি যখন তদুদেহে মঙ্গল বসন পরিয়া শ্বেত সুচারু অলঙ্কারে সাজিয়া তন্বী নববধূর রূপ ধারণ করিয়াছে তখন—প্রবাসী পথিক জনের চিত্ত সহসা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠা বিচিত্র নয়। তবু শরতে প্রকৃতি নিজের মহিমায় মহীয়সী,—মানুষের সুখদুঃখ তাহার সম্মুখে গৌণ, নিষ্প্রভ।

শরতের বর্ণনা শেষ করিবার ঠিক আগেই কবি শরতের বিলীয়মান সৌন্দর্যের ছবিটি দেখিলেন, অপূর্ব সে-ছবি—

শ্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মী কামস্য হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বক্ষ কনাস্তিমধরেষু মনোহরেষু কাপি প্রযাতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ॥
(শরৎ ২৫)

শরৎলক্ষ্মী নারীর আননে শরৎশশীর কান্তি, তাহার মণিনূপুরে হংসরব ও মুখে বন্ধুক পুষ্পের শ্রী রাখিয়া ধীরে ধীরে বিদায় লইয়া যাইতেছেন।

ভাষায় বা অলঙ্কারে ঐশ্বর্য নাই, শুধু ভাবেই ইহার সম্পদ্। এই যে নারীর অঙ্গে সমস্ত আভরণ সঁপিয়া দিয়া এই যে শরৎলক্ষ্মীর সুন্দর বিদায় গ্রহণ ইহার মধ্যে একটা মহিমা আছে

* বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারু পল্লবঃ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ স্থিতাঃ নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাদ্ ॥(১২)

যাহা আর কোনও ঋতুর বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই।

হেমন্ত, শীত ও বসন্তের মধ্যে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মানুষের বিরহমিলন একত্রে গাঁথা হইয়াছে,—অন্তরের মিলের অভাবে ও দুটি দিক্ অসমঞ্জস হইয়া রহিয়াছে। বসন্তবর্ণনার মধ্যে চিরাচরিত উপমা ও অলঙ্কার বৈচিত্রহীন বর্ণনা,—মহাকবির কোনও পরিচয় তাহাতে নাই।

ঋতুসংহারের প্রায় দেড়শত শ্লোকের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত সাধারণ কবিত্বহীন, প্রাণহীন। এগুলি কালিদাস না লিখিলে অন্য যে কোনও কবি লিখিতে পারিতেন। তবু মাঝে মাঝে দুচারিটি শ্লোকের মধ্যে ভবিষ্যতের মহাকবির আভাস আছে।—এ যেন কবির সৃষ্টির আকাশে উষার আভাস,—এখনও যথেষ্ট অন্ধকার, যথেষ্ট মালিন্য, অস্পষ্টতা, জড়তা—তথাপি ইহারই মধ্যে আছে মধ্যাহ্নসূর্যের অদৃশ্য ইঙ্গিত। যে কবি একদিন রঘুবংশে মেঘদূত-শকুন্তলা রচনা করিবেন তাঁহার মন এখানে অক্ষম চেষ্টার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে; পারে নাই। কিন্তু এই যে—প্রেরণার ব্যাকুলতা ইহারই মধ্যে ভাবী সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাই কাব্যমূল্যে ঋতুসংহার দীন হইলেও কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে ইহা বহুমূল্য।

শকুন্তলা

শ্রীমমতা ঘোষ

রাজর্ষি ভুলেছে তোরে। স্মৃতির সায়রে
গভীর প্রণয় আজি হুতাশে গুমরে
দুর্ব্বাসার তীব্র শাপে। স্থির মহারাজ,
নাহিক' স্মরণে তোরে। শুধু পায় লাজ
সভাসদ্ সম্মুখেতে যখন জানালে
নিভৃত কাননে লোক-চক্ষু-অন্তরালে
সঁপিয়া সম্রাট তোরে হৃদয় আপন
অগ্রমহিষীর পদে করেছে বরণ।
দুষ্মন্ত হাসেন শুনি', হাসে সভাসদ;
বুঝিলে তখনি তুমি দারুণ বিপদ
আসিতেছে আঁধারিয়া জীবন-গগন,
এখনি রাহুর মত 'বিস্তারি' বদন
তোমারে ফেলিবে গ্রাসি'। তারপর আর
কিছু নাহি রবে, শুধু রবে অন্ধকার।
সরমে শঙ্কায় তুমি কম্পিত অন্তরে
করিলে প্রকাশ ধীরে বনের ভিতরে
ঘটেছিল যাহা যাহা। তৃণ তরু লতা
জেনেছিল দুজনার মিলনের কথা।
সাক্ষী আছে তপোবন, সাক্ষী মৃগশিশু,
প্রিয়ম্বদা অনসূয়া জানে সব কিছু।
কিছু কি আজিকে রাজা হয় না স্মরণ?
কেমনে ভুলিলে তুমি বিদায়ের ক্ষণ,—
দুটি চিত্ত ভারাক্রান্ত, চারি চক্ষে জল,
চরণে কত না দ্বিধা, প্রণয়ী যুগল
বিদায়ের লগ্ন চাহে দীর্ঘ করিবারে।
আশ্বাস দিলে যে তুমি আশ্রমবালারে
রাজ্যে ফিরে গিয়ে ত্বরা পাঠাইবে রথ
মহিষীর লাগি'। শুধু দেখিয়াছে পথ,
উড়োনি পথের ধূলি। রথ-চক্র-রব
জাগালো না চিত্তে তার আনন্দ-উৎসব।

যাত্রাকালে যে অঙ্গুরী দিয়েছিল হাতে
বিমুগ্ধারে,—দেখে দেখে দুটি নেত্রপাতে
নামে নিঃক্লান্তির ছায়া। অক্ষর গণনা
তবু কি হল না শেষ? আপন ভাবনা
বিভোর কিশোরী চিত্ত। কিছু জানে নাই
কেবা এল গেল কেবা—বাহ্য চেতনাই
নাহি ছিল। অন্য মনে কাটিয়াছে দিন,
জানে নি জীবনে ঘোর ঘনায় দুর্দ্দিন।
জানে নি কোথায় কার শড়েছে নিঃশ্বাস,
আজ সেই ক্রুদ্ধ তার বিষাক্ত বাতাস
লাগে আশ্রমিকা গায়ে।

তোমার প্রতীক
অঙ্গুরীয় দেখাইলে চিনিবে কি ঠিক
আশ্রমকন্যারে ফিরে? তব অঙ্গীকার
স্মরিয়া মহিষী ব'লে করিবে স্বীকার
তপোবন-বাসিনীরে? তবে তাই হোক,
তব নামাঙ্কিত মুদ্রা আজি সর্ব্ব লোক
দেখুক সভার মাঝে। সর্ব্ব লজ্জা গ্লানি
দিক মুছাইয়া তব অঙ্গুরীয়খানি।

অঞ্চলের প্রান্ত হইতে ব্যস্ত শকুন্তলা
খুলিবারে গেল যেই—ক্ষীণ শশিকলা
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যেন লজ্জা বেদনায়
সমস্ত দীনতা তার লুকাইতে চায়
আকাশ মাতার কোলে। খুঁজিছে আশ্রয়
তেমনি কাতর এক তাপসী হৃদয়
রাজ-অঙ্গুরীয় মাঝে। কে পারে ঘুচাতে
বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা দীপ্ত রশ্মিপাতে
অভিজ্ঞান মুদ্রা বিনা? সহসা ভূতলে
শব্দ শুনি' চমকিয়া চাহিল সকলে।
"মাগো" বলি' শকুন্তলা হারায়ে সম্বিৎ
পড়িয়াছে ধরাতলে। যেন রে তড়িৎ
উজলিয়া এ শিথিল সহসা লুকালো,
চারিদিকে খোঁজে সবে কোথায় মিলালো।

মূর্চ্ছা কি মাতার মত বাড়ায়ে দুখানি
মমতা মেদুর বাহু নিল তোরে টানি'
আপন বক্ষের মাঝে? স্তব্ধ হল ব্যথা,
ঘুমালো জীবন জোড়া বিপুল ব্যর্থতা

অঞ্চল রয়েছে শূন্য—অঙ্গুরীয় নাই
তার মাঝে, শকুন্তলা খুঁজিল বৃথাই।
বারে বারে দেখে তবু বিশ্বাস না হয়
মনোমাঝে। শচীতীর্থে স্নানের সময়
হয়েছে অঞ্চলচ্যুত। আবেশ-বিহ্বল
ছিল চিত্ত, নেত্রে ছিল স্বপন কাজল,
বোঝে নাই কী হারালো। বিশ্বে অনুপম
বধূ পাশে নাহি হবে প্রিয় সমাগম
কোনদিন? মাঝখানে রবে অভিশাপ,
দুর্ব্বাসার দুরন্ত সে নিঃশ্বাসের তাপ
লেগেছে যখন দেহে—'নাহিক' নিস্তার,
দুজনার মাঝে তাই দুস্তর পাথার।

মেঘমায়া

শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী

সুমিতা সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। হিমালয় দার্জিলিং তাই ওর কাছে শুধুই দার্জিলিং নয়; এর ছন্দে কবিতা, গন্ধে কালিদাসের পুষ্প-লতা, শৈলশিখরে দেবতাত্মা, নির্ঝরিণীর নূত্যে গন্ধর্ব-সাধনা। সুমিতা আবিষ্ট, সুমিতার জীবন এখানে সাধারণ জীবন নয়। নয়নে যে প্রদীপ জ্বললে নয়নোত্তরকে ধরণীর উত্তরে দেখতে পাওয়া যায়, সেই প্রদীপের দীপালি জ্বেলে সুমিতা স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয় ম্যাল-এর বিলাসী অমাবস্যা। গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপের ফুটন্ত আনন্দকে অতিক্রম ক'রে ওর মন হিমালয়ের অন্তরে ও কন্দরে কোন্ অস্ফুট বা নিগূঢ় অনন্তকে যে সন্ধান করে বেড়ায়, সকালে ও সন্ধ্যায়, তা সে নিজেই ঠিক বোঝে না।

বুঝলে ঘন বন-জঙ্গলে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত না—কার জন্য প্রতীক্ষা? উমা কি সত্যই তপস্যা করছে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষে? কোন্ অদৃশ্য দূর দেশে বসে মহাদেব কি হঠাৎ চকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবেন ওর প্রেমাঞ্জলির ব্যথিত নিবেদনে?

হায় কবি কালিদাস! এই যুগ আধুনিকের যুগ, তোমার ভক্ত পাঠিকাও আধুনিকা; বারোটা না বাজতেই তাকে হোটেলে ছুটতে হয় গরম খাবারের লোভে। কিন্নর কিন্নরীরা হয়ত তখনই অপরূপ সঙ্গীতে অবনত হয় তোমার পাদপীঠে, যখন সুমিতা হোটেলের উৎকট ঐক্যতানের সংযোগে অনেকখানি মাছ মাংস ডিম সযত্নে উদরস্থ করে।

একথা ভাবতে ভাবতে সুমিতার মন উচাটন হয়ে উঠল, হঠাৎ একটা আলোর রেখা পড়ল ওর মনে···মনে হলো, আহারটা নিত্য ব্যাপার, কিন্তু কাব্যবিহার নিশ্চয়ই অনিত্য অর্থাৎ নিত্যেরও যা উপরে। এই অনিত্যের জন্য নিত্যকে যদি কয়েকদিন এড়িয়ে চলতে হয়, ক্ষতি কি। চোখের দৃষ্টি-দীপকে তুলে ধরতে হলে দেহটাকে অন্তত কিছু পরিমাণে বঞ্চিত করা দরকার।

এমনি মন নিয়ে সুমিতা একদিন দুপুরে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে গিয়ে পড়ল ঠিক নেই। পাহাড়ের পর পাহাড় শুধু, লোকালয় দেখা যায় না। এদিকে ঘন বন, ওদিকে নিঝরের তড়িৎ স্পন্দন। আর, মাথার উপরে? ইস্ কী বিশাল মেঘের ঘনঘটা! ভয়ে অবসন্ন হতে না হতে, অকস্মাৎ অকারণে সুমিতার মন আনন্দের ঝলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। একাকিনী এক সিদ্ধ তরুণীর মতন দুই কালো হরিণ-নয়ন তুলে সে মেঘের অপরূপ দৌরাত্ম্য অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে যে মেঘ উপরে ছিল, সেই মেঘ নীচে এসে নামল। বৃষ্টি নয়, বাদল নয়,—শুধু মেঘ। কুয়াশা, বাষ্প, জলীয় যবক্ষার। তারই মধ্যে কত অপরূপ মায়াময় সৃষ্টি, কত ফুল কত লতা, গন্ধর্ব ও কিন্নর, বন উপবন, হিরণ্য উপত্যকা, সমাধির আবেশ—ধ্যানদেশ। বায়ু সেখানে অকারণে স্তম্ভিত, চপল হতে যেন ভয় পায়। পার্বতী নাই, উমা পূজারিণী নয়, সতীর স্মৃতি বিলীন। কুমার শিব, প্রসন্ন বদনে শোকও নাই প্রেমও নাই।

অবাক হয়ে দেখতে লাগল সুমিতা—কাব্যের সঙ্গে মিলছে না কি, সামনে ওই কুটিরখানি কার? নন্দী-ভৃঙ্গীরা কোথায়? এখনই কি অঙ্গুলিহেলনে দূর করে দেবে ওকে কুমার তাপসের তপোবন থেকে? কত যুগের চপলা গৌরী ওর অন্তরে নৃত্য করে শিবের ধ্যানভঙ্গের জন্য, তা এখানকার সম্মোহনে অমনি ধরা পড়ে যায় কেন? অঞ্জলিভরা ফুল দেবে ওই গিরি-সন্ন্যাসীর পায়ে, তাই তো এখানে আসা, তাই—

"পথ হারিয়েছেন আপনি?"

সুমিতা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল—কুমার যোগী ধ্যান ভেঙে ওকে শুধালেন, "কোন পথে যেতে চান, বলুন আমি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।"

আবেশমাখা বড় বড় চোখ তুলে সুমিতা ঘুরে দাঁড়ালো··

গেরুয়াধারী নয়, গায়ে গৈরিক আলোয়ান; জটা-জাল নয় তবে, চুলগুলো ঈষৎ কটা। চোখে শিবের প্রশান্তি, অধর প্রান্তে কিন্তু ব্যঙ্গভরা ঈষৎ হাসি। সেই হাসি হেসে, ফিরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "আমার পেছন পেছন আসুন।"

কোথায় যেতে হবে, সুমিতা প্রশ্ন করল না। বিনা বাক্যে নিঃশব্দচিত্তে অনুসরণ করল, যেন এই জন্যেই ওর জন্ম, এরই জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল।

পথপ্রদর্শক দীর্ঘদেহ, দেহের অনুপাতে তাঁর লম্বা লম্বা পা ফেলা; হয়তো তাই, প্রায়ই থেমে ফুলের গুচ্ছ কুড়িয়ে নেবার অবসরে অবসর দিচ্ছিলেন সুমিতাকে কাছে আসবার। কিন্তু সে ঈষৎ কাছে আসতেই তাঁর পুষ্পক্রীড়া থেকে চকিত হয়ে সরে দাঁড়িয়ে আবার সুরু করেন সেই—দীর্ঘছন্দের চলন।

কতখানি পথ হাঁটল ওরা, সুমিতা জানে না। অনেক-খানিই হবে হয়তো, কারণ পথের ধারে শিলারাশির উপর হঠাৎ তিনি শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়লেন, চোখ দুটি আনত। সুমিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, স্বাভাবিক শ্লথগতিতে।

অপরিচিত তেমনি নত চোখে উঠে দাঁড়ালেন, সুমিতা ভাবল এখনই আবার সুরু হবে সেই যাত্রা।

কিন্তু·····

তপোবন স্তব্ধতর হলো, অদূরে বসন্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে লাগল, তাপস বলছে·· ···

কী বলছে? সুমিতাকে?

"আবার যদি চিনতে পারো, আবার যদি কাছে আসো, ভিড়ের ভিতর থেকে যদি নিতে পারো বেছে, তবেই জানব মেঘের মায়া নও তুমি। জানব, তুমি সত্য আমার জীবনে। ততদিন মনে রাখবার মতো কিছু দাও। দেখি, তোলো চোখ দুটি!".

বলে নিজেই মুখখানা তুলে ধরলেন, শিউরে উঠে সুমিতা নির্বাক চেয়ে রইল।

গভীর—গভীর দৃষ্টি নামিয়ে অনেকক্ষণ অপরিচিত ওকে দেখলেন, মনে হলো কিছু বলবেন, কিন্তু বললেন না।

তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসলেন। পরক্ষণে, সুমিতাকে অতিরিক্ত বিস্মিত করে দিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন একটা অন্ধকার উপত্যকার দিকে।

বিহ্বল ভীত হৃদয় সুমিতার কেঁপে উঠল; কি যেন হারিয়ে গেল, কোন্ তার যেন ছিন্ন হয়ে গেল জীবনবীণার। মেঘের পরে মেঘ, কিন্তু সৃষ্টি নাই, দৃষ্টি নাই। তবু, পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওকি দেখা যায়? হোটেলের উঁচু চূড়া নয় কি?

সুমিতা পথ হারিয়েছিল, এই তো সবাই জানে। যেটুকু জানে, তার বেশি জনতাকে জানানো ওর স্বভাব নয়। ও একলা থাকে, আপন মনে ঘুরতে ভালোবাসে, যাদের চায় না তারাও ওকে চায় না। নতুন ক'রে তাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করা এখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রত যদি পালন না-ই করবে, তাহলে ভিড়ের ভিতর থেকে সেই একজনকে সে খুঁজে নেবে কি করে?

হয়তো মরীচিকা, হয়তো বা স্বপ্নের স্বর্ণমৃগ; পিছনে তার বৃথা দৌড়ানো উচিত নয়। অপ্রাকৃতিক স্থানে অস্বাভাবিক সাক্ষাৎ—ঠিক যেন কোনো অমানব এসেছিল মানবীকে ছলনায় ভোলাবার জন্য! সবই সত্য।

কিন্তু শেষের সেই স্পর্শটুকু? সে তো এখনো রক্ত-দোলার মতো রিম-ঝিম করছে সুমিতার সারা অঙ্গে। সেটিই প্রকৃত, পার্থিব, বিদায়ের আগে "কিছু দেওয়া—মনে রাখবার মতো"।

অতএব সুমিতা ভুলতে পারে না। স্মৃতির দীপে উজ্জ্বল সল্‌তে জ্বালিয়ে সে জনারণ্যের অন্ধকারে ক্ষণেকের দেখা স্বল্পপরিচিত সেই নির্জনচারীকে খুঁজে বেড়ায়।

ওর অজ্ঞাতসারে ক্রমে ওর স্বভাবও পরিবর্তনের পথে চলল। একটুকু দেখা, একটুখানি পরশ; দিনের পরে দিন তাকেই যদি মনের মাঝে অতি বৃহৎ করে ধরে রাখতে হয়, তবে বাইরের জগতটা, সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও, চেতনার দরবারে ছোট হয়ে যায় বই কি।

সুমিতা বাইরে ছোট অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর হয়ে, ভিতরে বড় হতে লাগল। মধুরতম আবেশ, প্রিয়তম অনুভূতি যেন ওর হৃদয়ের রক্তের কণিকা থেকে শিকড় প্রসারিত ক'রে ফলে পুষ্পে পার্থিব জীবনখানিকে অনির্বচনীয় করে তুলল।

সবাই বুঝল ও বলল 'সুমিতা প্রেমে পড়েছে,' কিন্তু কার

সঙ্গে? কে সেই ভাগ্যবান? ওর হিতৈষীরা সকলেই ওকে সযত্নে লক্ষ্য করতে লাগল।

এদিকে দিনের পর দিন কেটে যায়, সুমিতার আসল দিন তবু কাটে না। মেঘমায়ার ছায়া পড়েছে মনের আকাশে, একটি অবিস্মরণীয় দিন সেখানে চিরদিনই দিন। রাত্রির অন্ধকার ঘনায় না, আছে বিশ্বাসের স্থির প্রতীক্ষা—আবার দেখা হবেই। প্রেমের ব্যাকুলতা কেটে গিয়ে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সত্যদীক্ষার শান্ত স্ফুরণ। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো ধবল দেহ সেই সত্যের, কাঞ্চনের আভাস বিম্বিত সারা গায়ে।

ফিরে এলো সুমিতা কলকাতার জনারণ্যে। ততদিনে কোথায় যেন ওর প্রতীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, আর ভাবেনা, আর চায় না। মনের মধ্যেই মন ধ্যাননিবিষ্ট, বাইরে এখন পেলেও হয়, না পেলেও ক্ষতি নেই।

নাগরিক কোলাহলের কাছেই অথচ কোলাহলের থেকে সুদূরে, ছোট একখানি বাড়ি—সুমিতার বাড়ি। স্কুলে কাজ করে, সন্ধ্যাবেলায় ফিরতে হয়। শান্ত স্বভাব, কবি-মন, জীবন সম্বন্ধে উৎসুক চিত্ত। তাই শিশুরা ওকে ভালোবাসে। ওর অনেক বিদ্যা সত্ত্বেও সে শিশুশ্রেণীর পাঠালাপের ভার নিয়েছে।

"মিতাদি, গল্প বলো"।

"তোমরা বলো, আমি শুনি।"

শিশু-মনের এই রহস্য—গল্প শোনার চেয়ে গল্প শোনাবার ঝোঁক তার বেশি। কত মিথ্যা কথা, কত কল্পনা। যদি না শোনো, তবে কল্প-প্রাসাদ ভেঙে দিলে। যদি শোনো, শিশু হয়েই শুনতে হবে। সুমিতার সেই গুণ আছে। তাই সে শিশুদের প্রিয় বন্ধু।

প্রিয় বন্ধু হলে প্রিয় বন্ধনও থাকে, স্নেহের প্রেমের অনাত্মীয় আত্মীয়তার শত উৎসবে ক্ষুদ্র বন্ধুরা একে টেনে নিয়ে যায়। এমনি ক'রে এই অঞ্চলে সুমিতা সুপরিচিতা। অনায়াসে যা হয় তার জন্য সে মোটেই আয়াস প্রয়োগ করে না, সেজন্য আজও সে কুমারী অথচ বহুজনবাঞ্ছিতা। সুরূপা সগুণা, অতএব কোনো গৃহেই ওর অনাদর নাই।

"ওরে সুমিতা পরশুদিন বিকেলে একবার আসিস, বরুণের জন্মদিন। জানিস তো?"

"আসব বই কি, মাসিমা। স্কুল ফেরত চলে আসব। কই, বরুণ কোথায়?"

ও খাটে, পরিশ্রম করতে জানে। বলতে হয় না, ডাকাডাকির হাঙ্গামা নেই; ঘর সাজায়, পানের খিলি গুছিয়ে তোলে। নিমন্ত্রিতেরা ওকে নিমন্ত্রিত বলে জানে না, অপরিচিত আগমন হলে মনে করে বাড়িরই কেউ।

বরুণ ওর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যেও প্রিয়। সুন্দর চঞ্চল শিশু, দুরন্তপনার শেষ নেই। বাগানে ফেলে রাখতে হয় সেই ফেলে রাখাই ওর পড়া। আশ্চর্য ওর কল্পনা। মেঘের প্রাসাদে সত্যের অপরূপ জয়স্তম্ভ সে এমন নিপুণভাবে রচনা করে যে, বয়স্কদেরও হঠাৎ কখনো মনে ধাঁধাঁ লেগে যায়, বলে, "তাই তো!"

এই বরুণের কি-নাকি একটা ডাক নাম ছিল—অয়স্কান্তমণি। কিন্তু সুমিতা সেটাকে এমনি ছেঁটে ফেলেছে যে চিনবার যো নাই। বরুণ যখনই ছুটুমির কল্পনার উচ্চতম শিখরে, সুমিতা ঠিক তখন ওর মধুরতম মৃদুস্বরে ডাক দেয়, "কানুমণি!"

আজ এই জন্মদিনেও বাগান থেকে ওকে কিছুতেই যখন ধরে আনা যাচ্ছে না, পত্রপল্লবের খেলা ছেড়ে কিছুতেই সে আসবে না, সুমিতাই তখন এগিয়ে গেল, "কানুমণি, কানু!"

"কেন? আমি আসব না।"

"চন্দনের কৌটা পরেছ কখনো? এই দেখ কেমন সুন্দর গন্ধ!"

"মিতা, তুমি এখানে এসো না, বন্ধুরা রয়েছেন।"

সুমিতা একটু আশ্চর্য হলো, কি রকম পাকা কথা বরুণের! হঠাৎ কোথায় শিখল এসব বুলি?

"বন্ধুরা রয়েছেন তো হয়েছে কি? আমিও তো একটি বন্ধু তোমার।" বলে সুমিতা আরো এগিয়ে এলো।

এবার বরুণের কণ্ঠস্বর বাস্তবিকই ত্রস্ত হয়ে উঠল, "না, না, এসো না, এসো না মিতা, সত্যি বলছি অনেকে রয়েছেন—"

বিরক্ত হয়ে উঠল সুমিতা, শিশু যত খুসি দুরন্ত হোক, গোপনীয় কেন হবে?

জোর করে সে খেলার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, তারপর বরুণের প্রসারিত দুই হাতের নিষেধকে ঠেকিয়ে ওর মাথার উপরে উঁচু হয়ে দেখল, খেলাঘরের অনেক শিশুর মাঝখানে একটি বয়স্ক শিশু—বিভোর হয়ে আছে হাতে একটা বিশেষ খেলনা নিয়ে। মুখখানির কিছুই দেখা যায় না, সুমিতা এসেছে জানে—বোধহয় দেখতে দিতে চায়না।

"মামা, ওই যাঃ, সব দেখে ফেললো!"

উত্তরে মামা মুখখানা আরো নত ক'রে আরো গোপন করল নিজেকে। সুমিতা বিস্মিত হলো। সত্যিই তো শিশু নয়, এ কিরকম অভদ্রতা?

চলে যাওয়া উচিত কিন্তু যেতে পারল না। অজানা কি-এক আকর্ষণে দাঁড়িয়েই রইল।

অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোক খেলনা ফেলে উঠে দাঁড়ালো। সুমিতার দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে ছেলেদের ইসারায় কাছে ডেকে বললে, "এবার চলি। বরুণ, ভিতরে যাও, সময় হয়েছে।"

শিশুরা বুঝতে পারল এই রসভঙ্গের কারণ সুমিতা। তাই ওদের যেমন দস্তুর, রসভঙ্গকারীকে ত্যাগ করে চলে গেল। দুরু দুরু বুকে সুমিতা অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু অপরিচিত তবু মুখ ফেরালো না।

অগত্যা সুমিতা সামনে এসে দাঁড়ালো, বললে, "একি চেহারা আপনার?"

তবু উত্তর নাই।

আরো একটুক্ষণ অপেক্ষা করে সুমিতা হেসে বললে, "মুখ দেখে চিনব, সে সাধ্য আমার নাই। অনেক পরিবর্তন এনেছো।"

এবার উত্তর এলো, "তবে চিনলে কিসে?"

"আনন্দে।"

"এখন তাহলে পাড়ি দেবার সময় হয়েছে!"

"হয়েছে।"

"তবে চলো।"

"আজই?"

"আজই।"

সত্যেশ বরুণের মামা।

এক সময়ে সুমিতাকে ভালোবাসত। কিন্তু সে কথা কবিতায় ফলাও করে বলতে গিয়ে কঠিন আঘাত খায়। সুমিতা জানত, বে-আদবের শিক্ষা হলো, আর কখনো আসবে না। সত্যিই আসেনি। মোহগ্রস্ত মনকে নিয়ে কোথায় যে উধাও হলো কেউ জানে না এরকম একটা দুর্ঘটনার জন্য সুমিতা প্রস্তুত ছিল না, মনে মনে নিজেকে কত দোষারোপ করতে লাগল। সত্যেশের মায়ের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে ক্ষমা চাইল।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো কিন্তু সত্য আর ফিরল না। সুমিতার মনে দাগ কেটে গেল এই বেদনার ব্যাপারটা।

তারপর একদিন শোনা গেল সত্য সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে কোথাও আছে। সুমিতা বিশ্বাস করল না, সন্ন্যাসী হওয়া-টওয়া—ওসব মিছে কথা! কিন্তু একটা নূতনত্বের আকর্ষণে মনটা যেন কেমন তৃষিত হয়ে উঠল। যে অনুরাগের মধ্যে সে যৌবনের তরলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি, বেদনার গাম্ভীর্য মেখে তা হঠাৎ ওর হৃদয়কে প্রবলভাবে টান দিলো। সত্য যে এত সিরিয়াস ছিল তা কে জানত!.....

দার্জিলিঙের সেই অনবসর কল্পনা, হিমালয়ের গুহায় গুহায় তপস্বীদের দিকে ওর মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। কোথায় সতীনাথ ধ্যানমগ্ন, না দেখলে বিংশ শতাব্দীর সুমিতা মানুষের মধ্যেও আর মানুষ দেখতে পায় না। বয়স হতে চললো; এখনও বিয়ে হয় না, তবু শিবের আসন টলে না কেন, কিছুতেই সে বুঝতে পারে না। ত্যাগের গৈরিকে সত্যেশ কি সত্যই শান্তি খুঁজে পেয়েছে?

এমনি সময়ে সেই মেঘমায়া, সেই পথ হারানো, সেই কর স্পর্শ, সেই শিহরণ! সত্যেশকে সুমিতাকে নিয়ে মেঘের সেই যাদু!

দুজনে দুজনকে চিনতে পারেনি বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু তবু সুমিতা চিনতে চায়নি, সত্যেশ চায়নি ধরা দিতে।

হঠাৎ বিদায়ের ক্ষণে সব ওলটপালোট হয়ে গেল। ঈষৎ মতিভ্রম, ঈষৎ স্পর্শ—আর সুমিতার জীবনে এসে পড়ল মহা-বিপ্লব। একটুখানি ছোঁয়া দিয়ে যে যাদুর তরঙ্গ সঞ্চারিত করে দিলো সত্যেশ, তাতেই সুমিতা অন্তরে সতীর তাপসী হয়ে উঠল।

কোথায় নিয়ে যাবে, সন্ন্যাসী ?"

"সুদূরে।"

"সে কোন্ দেশে ?"

"অন্তরের অন্তঃপ্রদেশে।"

ছলোছলো, ভাবে-ভরা চোখে সুমিতা একবার চেয়ে দেখল ওর দিকে—সত্যেশ সুন্দর দেখতে! কিন্তু এই সৌন্দর্যে সে আজ শুধু মোহনই নয়, কি একরকম উদাসীনও বটে।

"সুমিতা, আগে একটি কথা।"

"বলো।"

"আমি দীক্ষিত তাপস।"

"ভালো!"

"ভালো না বাসলে তুমি আমার পথে আসতে না।"

"না।"

"জানো তো, আমার অন্য পথ নেই? আছে শুধু একটি ?"

সুমিতা হঠাৎ ভিখারিণীর মতো ওর পদপ্রান্তে বসে পড়ল, বলল—"মিথ্যে কেন এসব প্রশ্নোত্তর? তুমি তো জানো পার্বতী দু'বার আসে না, প্রেমের ডাক জীবনে একটিবারই। আমার হৃদয়ে আমি গৌরীর সেই ইঙ্গিতে শুনেছি। কোথায় যেতে হবে, চলো।"

গভীর নিশীথে নয়……স্পষ্ট দিনের আলোকে, সত্যের হাতে হাত রেখে সুমিতা নিরুদ্দেশ হলো। পিছনে পড়ে রইল সংসার, সমাজ, আদর্শের শত সংজ্ঞা।

যে শুনল, সেই দিলো ধিক্কার—ধিক শিক্ষা দীক্ষা, ধিক বিদ্যা বিহার, যে নারী স্বৈরাচারিণী তার সকলই ধিক্!

বাঙলার মেয়ে

শ্রীনীলিমা দেবী

বাঙলার মেয়ে বলতেই মনে জেগে ওঠে শান্ত শ্যামলশ্রী-মণ্ডিত একখানা মুখ; কল্যাণরূপে, ভগ্নীরূপে, বধূরূপে, মাতৃরূপে তার স্নিগ্ধ কোমল কল্যাণী মূর্ত্তি ভেসে ওঠে আমাদের চোখের ওপর। কলসী কাঁখে ধীর পদক্ষেপে সে যায় জল আনতে, অবগুণ্ঠনের ফাঁকে দেখি তার কালো কাজল চোখ; তুলসী তলায় প্রদীপ হাতে দেখি তার সান্ধ্যশ্রীমণ্ডিত অপূর্ব্বমধুর রূপ; পূজা-পার্ব্বণ, বিয়ে-চূড়ো উপলক্ষে সুণিপুণ অঙ্গুলি চালনায় ফুটে ওঠে তার হাতের আঁকা বিচিত্র আলিম্পন; রন্ধন গৃহে হাঁড়ি-কড়ার কর্কশ ঠনঠনানি ভুলিয়ে দেয় তার চুড়ির সুমিষ্ট কিনি কিনি; আত্মীয় বান্ধব, অতিথি-সজ্জনের রসনা পরিতৃপ্তি সাধন-ব্রতে দেখি তার অন্নপূর্ণা রূপ। আদর-অনাদর, সম্মান-উপেক্ষা, প্রশংসা-গঞ্জনা, সব কিছুর মাঝে ধীর স্থির শান্ত মূর্ত্তি সে, চরম সহনশীলতার প্রতীক এই বাঙ্গালার মেয়ে। বাঙলার কবির গানে, শিল্পীর চিত্রে, তার এই প্রতীকই নজরে পড়ে।

বাহিরের জগতের পানে চোখ মেলে তাকাবার তার প্রয়োজন নেই, অধিকারও নেই, গৃহই তার পৃথিবী, গৃহের কল্যাণী সে, গৃহেই তার স্থান; বাঙালার মেয়ের এই আদর্শ ই পরম্পরাগত ভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাঙলার মেয়ে চিরদিনই ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি দেশের দশের কল্যাণ সাধন ব্রত নিয়ে সে ঘরের গণ্ডী পার হয়ে ইতিহাসের পাতায় তার ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে সে কথা আমরা মনেই রাখি না। অতি প্রাচীন কালেও তার বুদ্ধির দীপ্তি, জ্ঞান ও প্রতিভার বলে সুধী সমাজে স্থান অধিকার করায় ক্ষমতা ছিল। এ অধিকার সে অধুনা প্রাপ্ত নয়। একথার একটি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য যে খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন বিখ্যাত চীন-পর্য্যটক হিউয়েন সাং ভারতে আসেন, বাঙলার মেয়েদের বাক্যালাপের চাতুর্য্যে, এমন তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তির পরিচয় পেয়েছিলেন যে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে একথার উল্লেখ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে বাঙলার মেয়ের আরও একটি মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে—সে তার বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি।

বর্ত্তমান যুদ্ধে চীনা ও সোভিয়েট নারীর অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী শুনে আমরা চমৎকৃত ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি; কিন্তু একদিন এই বাঙলার মেয়েও শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যে বিমুখ হয়নি, আর শুধু অস্ত্রধারণ নয় বাহুবলে শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তিও যে তার ছিল, সেকথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশী উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাঙালার কাহিনীই শুধু আজ আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব। তাঁর নাম ভবশঙ্করী, সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা দেশে পুড়ুয়াগড়ে এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা দীননাথ চৌধুরী ঐ গড়ের এক সর্দ্দার ছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্রচর্চ্চা করাই, ভবশঙ্করীর পিতা শাস্ত্রচর্চ্চা, অস্ত্রচর্চ্চা দুই করতেন; রণদক্ষ বীর বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট আর তাঁর অধীনে ছিল বহু সৈন্য। মা নেই ছোট মেয়ে ভবশঙ্করী, তাকে বাবা এক দণ্ড কাছ ছাড়া করতে পারেন না। ঘোড়ার পিঠে তিনি যখন চলেন, সঙ্গে যোদ্ধার বেশে যায় ভবশঙ্করী। তিনি সৈন্যদের অস্ত্রশিক্ষা দেন আর একমনে ভবশঙ্করী যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখে দীননাথ তাঁকে নিজে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন অল্পদিনের মধ্যেই অস্ত্রচালনায় ভবশঙ্করী অসীম নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। ক্রমে বয়স বাড়ে তাঁর বিবাহের কথা পাঁচজনে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ভবশঙ্করীর পণ যে ব্রাহ্মণ সন্তান বীরত্ব ও বিদ্যায় তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন তাঁর গলায়ই তিনি বরমাল্য দেবেন। কাজেই, বিয়ে আর হয় না।

ভবশঙ্করী প্রায়ই একা একা ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে যেতেন। একদিন দামোদরের শাখা রোণ নদীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে হরিণ শিকার করতে গিয়েছেন, এমন সময় নদীর জল থেকে তিনটে বন্য মহিষ তেড়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাঁর অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপে ঐ তিনটে মহিষই একে একে প্রাণ হারায়। গড় ভবানীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণ ঠিক সেই সময় নৌকা করে চলেছিলেন কাটশাঁকড়ার শিব মন্দিরে। নৌকা থেকে রাজা এই মহিষমর্দ্দিনী কন্যাকে দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন, নৌকা থামিয়ে, তীরে নেমে ভবশঙ্করীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিলেন। রাজাও আবার নৌকায় ফিরে নিজের পথে চলে গেলেন, ভবশঙ্করীও ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন; কিন্তু রাজা মন থেকে সেই বীরাঙ্গনার অপূর্ব্ব চিত্র কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলেন না। তিনি অপুত্রক, কিছু-দিন আগেই এক সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন যে দ্বিতীয়া পত্নীই তাঁর বংশরক্ষা করবেন; সেই ভাবী রাণী মহাশক্তিশালিনী মহামায়ার অংশস্বরূপ—সে কন্যা তাঁর রাজ্যেই বাস করে এবং বিবাহের পূর্ব্বেই রাজা তাঁর দেখা পাবেন। তবে এই বীর-কন্যাই কি তাঁর সেই ভবিষ্যৎ রাণী? রাজা তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে সব কথা বল্লেন। কয়েকদিনের মধ্যেই গুরু গিয়ে দীননাথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। ভবশঙ্করীর ডাক পড়ল, ভবশঙ্করী তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা গুরুদেবের কাছে উল্লেখ করাতে গুরুদেব কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন, রাজা বার্দ্ধক্যের সীমানায় এসে পৌছেচেন, অসিযুদ্ধে একজন সর্দ্দার কন্যার কাছে যদি হয় পরাজয় তবে ভরস্থট রাজ-বংশের মর্য্যাদা হানির আর সীমা থাকবে না। তারপর গুরু এই অসি পরীক্ষার একটু রকম বদল করার প্রস্তাব করলেন এবং সে প্রস্তাবে ভবশঙ্করী সম্মত হলেন। রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরের সামনে হবে পশু বলি। পাশাপাশি দুটো মহিষের নিচে একটা ভেড়া রেখে রাজা খড়্গের এক আঘাতে তাদের ছিন্নশির করবেন, ভবশঙ্করীকেও ঐভাবে রাজার কাছে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে হবে। তারপর কুমারী হবেন স্বয়ংবরা।

শুভতিথিতে রাজবল্লভী দেবীর পূজার আয়োজন হ'ল মহা-সমারোহে। স্বয়ংবরের কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে, মন্দিরের চারদিকে লোকে লোকারণ্য। শাদা রঙের ঘোড়ায় চড়ে এলেন ভবশঙ্করী, টকটকে লাল রঙের তাঁর কাপড়, গলায় জবার মালা, কপালে রক্ত চন্দন ও সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে খোলা তরবারি ঝক্‌ঝক্ করছে। শক্তি পরীক্ষার পর রাজার কপালে রক্ততিলক এঁকে দিয়ে ভবশঙ্করী তাঁর গলা থেকে খুলে মাল্যদান করলেন রাজার গলায়। শুভদিনে কবি কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের বংশধর রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে ভবশঙ্করীর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-অভিযাত্রী

শ্রীমুকুলমাধুরী চক্রবর্তী

অজানাকে জানবার নেশা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। এই ধর্ম বশেই দুর্গম-পথে চলেছে কত মানুষ—অতীত যুগ থেকে। এঁদের ইতিহাসে মেয়েদের স্থান বেশি না হলেও যে কয়জন আছেন তাঁরা সাহসে, সামর্থ্যে এবং উৎসাহ-প্রাচুর্যে পুরুষেরই সমকক্ষ। আধুনিক মহিলা-অভিযাত্রী ডরোথি-মিলসের নাম প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর অভিযান-পথের কাহিনী অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর।

ডরোথি মিল্‌স্ বলেছেন : দুর্গম অরণ্য-পথে অসভ্য নরখাদক মানুষের সমাজে মনের বল, সাহস এবং মুখের হাসি—এই ছিল আমার পাথেয়। নতুবা শারীরিক শক্তি আমার আর কতটুকু? রোগা ছেলের মতো লিকলিকে শরীর—যার ওজন মাত্র ১০০ পাউণ্ড।

আফ্রিকা ভ্রমণকালে তিনি এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন যেখানে কোনদিন সভ্যমানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। বুনোমানুষের চোখে তিনি হলেন এক অদ্ভুত-দর্শনীয় জীব—তাই তারা প্রথমে খুব চঞ্চল ও রণমুখো হয়ে ওঠেছিল। তিনি তখন মুখের হাসি দিয়ে তাদের শান্ত করেছিলেন। হাসিতে জগত ভোলে। বুনোরাও তাই বশীভূত হয়েছিল। এক বুড়ী তাঁর হাসিমুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, ডরোথি মিল্‌স্ মানুষ নন—"হাসিমুখী শ্বেত জানোয়ার।" বুনো রমণীর মুখে ঐ রকমের উক্তি নেহাৎ অশোভন হয়নি।

ভ্রমণ-পর্যটনে ডরোথি মিল্‌স্-এর অটুট উৎসাহ। তাঁর জীবনের আরম্ভও পর্যটনের ভেতর দিয়ে। সাড়ে তিন বছর বয়সে পিতার সঙ্গে সাগরে বেরিয়েছিলেন মৎস্য-শিকার উপলক্ষে। তারপর তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তিনি নানা দেশে যান; বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু অজানা-অঞ্চলে তিনি অনেক বার ভ্রমণ করেছেন। সম্ভবত অভিযানের নেশায়—অজানাকে জানার আগ্রহে এত অল্প বয়সে আর কোন রমণী দুর্গম-পথে বেরিয়েছেন এমন নজীর ইতিহাসে নেই।

একক অভিযান—এই ছিল ডরোথি মিল্‌স্-এর অদ্ভুত নেশা। একমাত্র কৌতূহল—প্রকৃত অভিযানকারীর মতো দুঃসাহসিক কৌশল-ফন্দিতে অজানা দেশের অজানা মানুষের বিচিত্র চাল-চলনের পরিচয় লাভ করা। তাঁর এই কৌতূহল প্রায় সবক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। এবং এই সফলতার মূলেও রয়েছে তাঁর সদাপ্রসন্ন ভাব এবং সুন্দর হাসি—নানা অসুবিধার মধ্যেও যা কোনদিন মলিন হয়নি।

একবার টিম্‌বাক্‌টোর অরণ্য-পথে চলেছেন পায়ে হেঁটে। হঠাৎ এক নরখাদক মানুষের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। লোকটির প্রকাণ্ড শরীর, বিকট চেহারা, মোটা ধারালো দাঁত এবং মিটমিটে চাহনি।

প্রথমে তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তবে হতাশ হননি—কেননা হতাশ হওয়া পর্যটকের ধর্ম নয়। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে লোকটিকে ইঙ্গিত করলেন—পাশ কাটিয়ে চলে যেতে।

কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মতো। আচরণে বুঝা গেল—'অদেখা জীব সাদা-মানুষ' দেখে সে নিজেই বেশ ভয় পেয়েছে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাঁর হাসি পেল। হাসি মুখে লোকটিকে তিনি ভরসা দিলেন। লোকটি এবার আশ্বস্ত এক থলো জংলী জাম তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল।

বুনোমানুষের এই আশ্চর্য উপহার তিনি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছিলেন।

এবার ডরোথি মিল্‌স-এর লাইবেরিয়া ভ্রমণের কয়েকটি কথা বলব। দেশটি আফ্রিকা-মহাদেশের গিনি-উপকূলে—পালমা অন্তরীপের উত্তর-পূর্বে অনেক দূর পর্যন্ত। প্রায় ১২৫ বছর আগে আমেরিকার 'কলোনাইজিং সোসাইটি' এখানে আসেন এবং আফ্রিকার দাস-সম্প্রদায় নিয়ে বসবাস গড়ে তোলেন। ক্রমে জনসংখ্যা বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে লাইবেরিয়া একটি দেশ অর্থাৎ মহাদেশের অংশ। এখনকার অধিবাসীদের মূল ধর্ম—'দেশপ্রেম' ও 'স্বাধীনতা'। ধর্ম বলতে এক ভগবান এবং নানা দেবদেবীর উপাসনার প্রেরণা তাদের মনে জাগে না।

এক সময়ে লাইবেরিয়ার লোক অত্যন্ত অলস ও কর্মবিমুখ ছিল। এই কারণেই তারা প্রথমে সভ্যজগতের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে পারে নি। তবে ডরোথি মিল্‌স্ যে-সময়ে গিয়েছিলেন তখন দেশটি অনেকটা উন্নতির পথে। অন্য জাতিদের দমন করে সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার অধীনে বসবাসের অধিকার বাড়িয়ে তোলা চলেছে। তা হলেও, তখনও সে দেশে এমন অজ্ঞাত অঞ্চল ছিল (এখনও আছে বলে শোনা যায়) যেখানে এ পর্যন্ত সভ্য মানুষের নজর পড়েনি।

এই অজ্ঞাত-দেশের দুর্গম-পথে সর্বপ্রথম অভিযান করেন ডরোথি মিল্‌স্। অসভ্য-অধিবাসীরাও সভ্যমানুষের প্রথম পরিচয় পেয়েছিল—তাঁকে দেখেই। যেখানেই তিনি বিশ্রামের জন্য বসতেন, সেখানেই বুনোমানুষের ভিড় জমে যেত—তারা অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে দেখত একজন পরিচ্ছন্ন কায়দা-দুরস্ত সভ্য মহিলাকে।

প্রথমে রাজধানী মনরোভিয়াতে (Mourovia) আসেন। এখানে তাঁর বন্ধুবান্ধবীদের অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্কল্পিত অভিযানে। তাঁরা বলেছিলেন—দেশটা বুনো শয়তানের আড্ডা; বিশেষত এই বসন্তকালেই ওদের দৌরাত্ম্য বড় বেশি। অপরিচিত বা বিদেশী পথিক চোখে পড়লে ওদের উৎসাহের অন্ত থাকে না।

কিন্তু 'বুনোশয়তানের' নিষ্ঠুরতার বহু রকম রোমাঞ্চকর গল্প শুনেও ডরোথি মিল্‌স্ পিছ-পা হননি। উপযুক্ত লোকজন, কুলি ও বাহক সংগ্রহ করে তিনি একদিন অজানা-পথে রওয়ানা হলেন।

পথ-প্রদর্শক একজন স্থানীয় নিগ্রো—নাম টিকাপ। কৃত্রিম ফোয়ারার জল-নির্গম-পথে অদ্ভুত মূর্তি-কাটা চেহারার মতো তার মুখের ছাঁচ, ভূষাকালীর মতো গায়ের রং, বেঁটে গড়ন—অনেকটা বন-মানুষের মতো। নীচের ঠোঁট অদ্ভুত রকম পুরু ও ঝুলে-পড়া। হাতে-পায়ে ছয়-ছয়টি করে চব্বিশটে আঙুল। অধিকন্তু চোখদুটি মিটমিটে এবং নীল চশমা দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সে ছিল পাকা লোক; কাজকর্মেও খুব তোখড়।

এক রকম বাঁশের ডুলিতে চেপে ডরোথি মিল্‌স্ রওয়ানা হলেন।

পাহাড়ে সুঁড়ি-পথ—আঁকাবাঁকা হয়ে কোথায় চলে গেছে ঠিক জানা নেই। মাঝে মাঝে নালা, খাড়ি ও গর্ত।

একবার খাড়ি পার হতে যেয়ে ভারি রগড় হয়েছিল। এপাড়ে ওপাড়ে বাঁশের সরু সাঁকো—নীচে গভীর জলস্রোত। এই রকম পথে পার হওয়া ব্যাপারে বাহকেরা খুবই অভ্যস্ত। তারা অনায়াসে পার হয়ে গেল। কিন্তু দেখাদেখি ডরোথি মিল্‌স্‌ও সাঁকোয় পা দিয়ে মহাবিভ্রাটে পড়লেন। সঙ্গীরা তো হেসেই খুন! যা হোক, টাল সামলাতে সামলাতে কোন রকমে তিনি পার হয়ে এলেন। তেমন কোন বিপদ ঘটেনি।

এসব অসুবিধে তো ছিলই। তার উপর আহার্যের অভাবই তাঁকে খুব বিব্রত করে তুলেছিল। তবে বাহক ও কুলীদের জন্য তেমন ভাবতে হয়নি। কেননা অনেক সময়ে দেখা গেছে—উনো ভাত আর ঘোলাটে জল পেলেই তারা সচল। তা ছাড়া তাদের ধৈর্যশক্তিও অসাধারণ। পাহাড়ে পথ, মাথার ওপর কড়কড়ে রোদ, তা সত্ত্বেও তারা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সের বোঝা পিঠে চাপিয়ে দৈনিক কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথ অনায়াসে পাড়ি দিয়েছে। ঘুমানো-ব্যাপারেও ওরা এমন ধাতস্থ যে একবার বোঝা নামিয়ে শুতে পেলেই হল—হোক না স্যাঁৎসেতে মাটি।

কয়েক দিনের মধ্যেই ডরোথি মিল্‌স্ গভীর বনদেশে এসে পৌঁছালেন। দুর্গম-পথের আরম্ভ এখান থেকেই। সামনে পাহাড়ের পর পাহাড়—ডাইনে বাঁয়ে নিবিড় অরণ্য। কোথাও পথ গেছে সুড়ঙের মতো হয়ে,—কোথাও উঠেছে উঁচু দিকে; কোথাও বরাবর চলে গেছে গভীর খাতের ধার ঘেঁসে। আশেপাশে রাশি রাশি বন্য ফুলের বাহার। মাঝে মাঝে গরম হাওয়ার সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে। আর আশেপাশে

ঝোপের মাথায় রং-বেরংএর প্রজাপতির মেলা। বিপদ যেন লোভ দেখিয়েই পথিককে আকর্ষণ করে।

আফ্রিকার বিপদ-সঙ্কুল পথের বিবরণ আমরা একাধিক পর্যটকের কাহিনীতে পাই। নানা জাতের বানর, চিতাবাঘ, বন-বেড়াল, ভালুক, খেকশেয়াল, হায়েনা প্রকৃতির সেখানকার বন-রাজ্যের বাসিন্দে। পশ্চিম দিকে বন ক্রমেই নিবিড়। সেখানে বন্য হাতীর অবাধ অধিকার। তাছাড়া আরও কত রকমের অদ্ভুত জানোয়ার,—যেমন, কাদাজলে খর্বাকৃতি হিপোপটেমাস, কুমীর; গাছে গাছে দাড়িওয়ালা টিকটিকি, বহুরূপী গিরগিটি; সাপ ও নানাজাতীয় বিষাক্ত সরীসৃপ; জলা-ডাঙায় কেঠো-কচ্ছপ, পাইথন অজগর এবং ছোট-বড় অসংখ্য রকমের ব্যাং। তাছাড়া মাছি মশা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের নিদারুণ উপদ্রব।

সেদেশের সব-চেয়ে ভয়ঙ্কর কীট—রাক্ষুসে পিঁপড়ে। এই জাতের পিঁপড়ে ভয়ানক একরোখা। যে দিক দিয়ে ওরা চলে—সামনে যাই পড়ুক—পথ আট্‌কায় না কিছুতেই,—কেটেকুটে ওরা সেদিক দিয়েই যাবে। একবার এক মিশনারী মহিলা এই পিঁপড়ের কবলে পড়েছিলেন। শেষে সঙ্গীদের অনেক চেষ্টায় কোন রকমে রক্ষা পান।

লাইবেরিয়ার আবহাওয়াও বিশ্রী রকমের গরম। কিছুতেই ঠাণ্ডা হতে চায় না, অথচ বাতাসে কেমন স্যাঁতসেতে ভাব। রাতের বেলায় ঘামে-ভেজা জামা-মোজা হাওয়ায় ছড়িয়ে দিলেও শুকায় না—বরং আরও ভিজে চপচপে হয়ে ওঠে। জুতা বা চামড়ার স্যুটকেসের ওপর সবুজ রংএর ছাতা ধরে' সহজেই খারাপ হয়ে যায়।

সেখানে নূতন লোকের পক্ষে রাত্রিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানোও প্রায় অসম্ভব। ঘরের আলো নিব্‌ল কি সুরু হয় চামচিকের উৎপাত; ফড়্‌ফড়্‌ করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে তেলা-পোকার ঝাঁক।

ডরোথি মিল্‌স্ একবার ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মৃদু খচ্‌খচ্‌ আওয়াজ শুনে। শিয়রে ছিল টর্চ-আলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে জ্বালিয়েই দেখেন—বেড়াল-ছানার মতো বড় একটা সজীব জীব মাথার পাশে আরামে বসে নিশ্চিন্ত মনে বালিসের তুলো টেনে টেনে বার করছে। তাড়া করতেই সরে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অবশ্য সঙ্গীদের একজন ভরসা দিয়েছিল তাঁর এই দুরবস্থা দেখে: কি করবে ইঁদুরে? বাঘ, ভালুক বা অজগর—ও সবেতো তুমি একটুও ভয় পাও না অথচ সামান্য ইঁদুরে ভয়। ছিঃ-ছিঃ! বুনোরা হাসবে যে!

কিন্তু তিনি মোটেই ভরসা পান নি।

কয়েকদিন পর পাহাড়-সমতলে গ্রাম দেখা গেল। জংলী গ্রাম। দূর থেকে চমৎকার দেখায়। গ্রামের চারিপাশে সারি সারি তালবন—যেন প্রাচীর-ঘেরা দুর্গ-বিশেষ! সহরে থাকতে শুভাঙ্গধ্যায়ীদের মুখে যে নরখাদক 'শয়তান'দের কথা শুনেছিলেন, এবার পথপ্রদর্শক টিকাণের মুখে জানা গেল, ঐ গ্রামগুলিই নাকি সেই 'শয়তান'দের। আরও জানা গেল—গ্রামের তালবনের ছায়ায় রোজই শয়তান-ছেলেমেয়েদের পাঠশালা বসে। স্থানীয় ভাষায় এই পাঠশালাকে বলা হয় 'গ্রী-গ্রী' (Gri-Gri)। অনেক পর্যটক এই 'গ্রী-গ্রা'কে শয়তানের আড্ডা বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসলে ঐ বর্ণনার মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নাই। এখানকার বন্য-জীবন ঘিরে কত রহস্যই যে লুকান রয়ে গেছে এবং প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা-দীক্ষায়ও যে অধিবাসীরা নেহাৎ অসম্পূর্ণ নয়—সভ্য মানুষ এখনও বড় জানে না। ভ্রমণকারীদের অনেক কাল্পনিক বিবরণ পড়েই সাধারণ মানুষ বন্যলোকদের সম্বন্ধে অনেক বিপরীত ধারণা পোষণ করে থাকে।

'গ্রী-গ্রী'তে মেয়েদের ঘর-গেরস্থালীর কাজ শেখানো হয়। নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী নীতি-ধর্ম শিখবারও রেওয়াজ আছে। ছেলেরা সেখানে শিখে কিছু লেখা-পড়া, শিল্পকাজ ও ধনুর্বিদ্যা। শিক্ষাকাল আঠারো মাস এবং দরকার-বোধে দেড় বছর। অদ্ভুত এবং হাস্যকর ব্যাপার—'গ্রী-গ্রী'র গুরুমশাই! শিষ্য এবং গুরু মশাই-এর সম্পর্ক যেন অহি-নকুল সম্পর্ক। শিক্ষাকাল শেষ না হওয়া অবধি এক 'গ্রী-গ্রী' ছাড়া আর কোথাও গুরুমশাই-এর মুখ দেখা ছাত্রদের পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হয় এবং এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যু ও সমাজের ভক্ষ্য হওয়া। গুরুমশাই অন্ধকার রাত্রিতে বিকট মুখোসে মুখ ঢেকে চলাফেরা করেন। বেরবার আগে তাঁর কর্কশ হাঁকডাক গ্রাম কাঁপিয়ে তোলে। অভিভাবকেরা সে সময়ে যে যার সাধ্যমত ফলমূল বা আহার্য-সামগ্রী বাইরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে দরজার খিল এঁটে দেয়। পরে গুরুমশাই চুপিচুপি বাড়ী বাড়ী গিয়ে এই দক্ষিণা কুড়িয়ে আনেন।

সাইবেরিয়ার উত্তর-অঞ্চলে এসে ডরোথি মিল্‌স্ অপেক্ষাকৃত এক সভ্যজাতির সন্ধান পেয়েছিলেন। ম্যানডিনগো (Mandingoes) জাতি। লম্বা কৃষ্ণকায়, শক্ত গড়ন—স্বাস্থ্যের প্রতীক প্রতিটি মানুষ। আচার-ব্যবহারও কিছুটা উন্নত ধরণের। ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের পেশা। ধর্মে মুসলমান। তবে এক সময়ে ওরা ছিল সেমিটিক্‌স্। এবং এযুগে ওদের অনেকেই মধ্য-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতির সংস্পর্শে এসে বর্ণসঙ্কর জাতিতে পরিণত হয়েছে।

উত্তর-আফ্রিকার একটি বড় শহর সেনোকেল্লে। অভিযাত্রীদল এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করেছিলেন। এখানকার লোকেরা প্রকাশ্যে মাংস খায় না—আর যারা খায় তারা নরমাংসভোজী। ডরোথি মিল্‌স্ একথা আগে বিশ্বাস করেন নি। কেননা বরাবর তাঁর ধারণা ছিল যে, যারা শহরে বাস করে তারা শিক্ষিত না হলেও কিছুটা সভ্য। পরে তিনি বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে—শহরের স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই নরমাংস ভোজনের পক্ষপাতী। কেবল গভর্নমেণ্টের কঠোর শাস্তির ভয়ে প্রকাশ্যে কোন রকম মাংসই তারা খায় না। তা ছাড়া আরও জানা গেল যে এই হীনবৃত্তি দমনে গভর্নমেণ্টের এত চেষ্টা সত্বেও শহরের বাইরে কোন কোন অঞ্চলে রীতিমত নরহত্যা চলে; এমন কি হাট-বাজারেও নরমাংস অবাধে বেচা-কেনা হয়।

এই রকম নরভুক মানুষের দেখা ডরোথি মিলস অনেকবার পেয়েছেন। সাধারণত তারা গ্রামে বা শহরে সভ্য মানুষের মতো শান্তভাবে বাস করে। কিন্তু যখনই দলপতির নির্দেশ আসে, তখনই তারা গোপনে গ্রাম বা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। শিকার-কালে তারা হাতে বাঘনখ পরে; গায়ে চিতাবাঘের চামড়া। ঐ বেশে চিতাবাঘের অনুকরণে যখন ওরা চিৎকার করে বা ঝোপে-জঙ্গলে ওঁৎ পেতে বসে থাকে, তখন সহসা কেউ দেখলেও বুঝতে পারবে না যে ওরা চিতাবাঘ না—মানুষ। স্ত্রীলোকেরাও কখন কখন এই নৃশংস ব্যাপারে যোগ দেয়।

শিকারে বেরিয়ে ওরা কখনও শূন্যহাতে ফিরে না। কেননা, কোন বিদেশী বা অপরিচিত লোকের সন্ধান পেলেই দলপতির নির্দেশ আসে। তবু যদি কোন কারণে শিকার না মিলে, তখন পালাক্রমে কোন পরিবার থেকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা অপর কাউকে দান করার প্রথা আছে।

ভ্রমণকালে ডরোথি মিল্‌স্ এমন সব অদ্ভুত ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করেছেন—যা সভ্য মানুষ সহসা বিশ্বাস করবে না। যেমন, বন্যলোকের জাদুবিদ্যা বা মন্ত্রশক্তির কথা। সে-সব কাহিনী পরে বলব। [পরের সংখ্যায় সমাপ্য]

শাপমুক্তি

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

এই কি বাংলার নরনারী,
দেশের মেরুদণ্ড?
কঙ্কালসার উলঙ্গ শিশু, আর অর্দ্ধনগ্ন নরনারী।
পথে পথে ঘুরছে একমুঠি ভাতের জন্য।
জীবনে এদের কোনও প্রয়োজন নেই
নাম গোত্রহীন অগণিত নরকঙ্কাল।
পিপীলিকার মত বেরিয়ে আসছে গ্রামাঞ্চল হতে,
ছড়িয়ে পড়ছে শহরে প্রান্তরে।
সুসজ্জিত রাজপথ—,
শ্রমিকের রক্তঝরা অবদান;
ধনিকের বিলাস বাসর।

তারই আশে পাশে চলছে—
মৃত্যুর প্রহসন।
শুধু একমুঠি ভাত, একটু ফেন,
এরই জন্য এই কঠিন সংগ্রাম।
এরাই বীর সৈনিক,
পথে প্রান্তরে জীবনাহুতি দিচ্ছে নিঃশব্দে।
বিংশ শতাব্দির এই আধুনিক যোদ্ধাদের নূতন অভিযান;
কোথায় এর শেষ?
ওদের এই তাজা-শোনিতে দেশের মাটীতে,
যে বীজ রোপিত হচ্ছে, তা একদিন অঙ্কুরিত হবে।
ফুলে ফলে ছেয়ে যাবে, নগর ও গ্রাম।
আজকের বুভুক্ষিত অভিশপ্ত আত্মারা
সেই দিনই হবে শাপমুক্ত।

অভিভাবকদের দায়িত্ব

শ্রীরাধারাণী দেবী

মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক সময়ে এদেশে প্রবল আন্দোলন হয়ে গেছে। কালের প্রভাবে হোক্ বা অর্থনৈতিক চাপেই হোক্ বাল্যবিবাহ রহিত হয়েছে। গৌরীদানের সদিচ্ছা যদিও কোন অভিভাবকের মনে মনে থাকে সে পুণ্যলাভ এখন সহজসাধ্য নয়।

বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে কুমারী মেয়েদের অভিভাবকদের এখন অন্য একটি নতুন এবং কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সমস্যা সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করব। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে নির্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন মনে করি। কারণ বয়স্থা কুমারীদের বিবাহ এখন অনেক স্থলেই বাল্যবিবাহের চেয়েও অধিকতর করুণ হয়ে উঠছে, এদিকে অবহিত হওয়ার সময় এসেছে।

আজকাল মেয়েরা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত এবং কতকভাগ স্থলে শিক্ষিতা হয়েই বিবাহিতা হয়। এই সকল কুমারীদের বিবাহের ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনতা দান করা সঙ্গত কিনা এখানে আলোচ্য। এই স্বাধীনতা দানের মধ্যে কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুইই আছে। সুফল ও কুফল উভয়েরই সম্ভাবনা। এখানে যুক্তি বা ঔচিত্যের দিক দিয়ে মাত্র নয়, মানবতার দিক দিয়েও বিচার করে দেখা দরকার। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ ব্যাপারে তার নিজের ইচ্ছা, আদর্শ এবং রুচিকে আমলমাত্র না দিয়ে, বড়োদের অভিজ্ঞতা ও অভিরুচি-নির্বাচিত পাত্রে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব সামান্য নয়। এই গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে অভিভাবকদের ধীরভাবে চিন্তা করে দেখার দিন এসে পড়েছে।

বয়স্থ পুত্রের বিবাহে অভিভাবকদের আগের মত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার এখন আর চলে না। তার কারণ ছেলেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং উপার্জ্জনের স্বচ্ছন্দ শক্তি আছে। এজন্য বহুস্থলে পাত্রের রুচি এবং ইচ্ছাকে পিতামাতাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়ে চলতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থনৈতিক অধীনতা ও উপার্জ্জনের স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠশক্তির অভাবের জন্য তাদের দুর্বল অবস্থার সুযোগে অভিভাবকদের কর্ত্তৃত্ববোধ এবং দায়িত্ব জ্ঞান প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে বহু বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীকে নিজের আদর্শ ও রুচির বিপরীত জীবনের মধ্যেই অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এর ফলে শুধু মেয়েদেরই জীবনে ব্যর্থতা ও অকল্যাণ নেমে আসে না, অপর পক্ষ অর্থাৎ স্বামী, এমন কি সন্তান সন্ততি পর্যন্ত এর অকল্যাণের স্পর্শ হতে অব্যাহতি পায় না।

কন্যার স্বনির্বাচন অনেক স্থলেই অভিভাবকদের আদর্শ ও রুচির পরিপন্থী হয়ে থাকে। এটা সমস্যার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং অভিরুচি সুস্পষ্ট গড়ে ওঠার পর শিক্ষিতা ও বয়স্থা কুমারীর পাত্র নির্বাচন যদি পাত্রীর আদর্শ ও রুচির পরিপন্থী হয়, সেটা আরও অধিকতর সমস্যার বিষয় নিঃসন্দেহ।

অভিভাবকেরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই মনে করেন, প্রথম যৌবনের রঙীন মোহে সংসার-অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়েরা Sentimentকেই প্রধান করে তুলে, জীবনের কঠিন বাস্তব দিক্‌টা মোটে দেখতে পায়না বা স্বীকার করতে চায়না। কিন্তু পরে সেই বাস্তবেরই কঠোর চাপে Sentiment তো চূর্ণ হয়ে যায়ই, জীবন তখন অনুতাপজর্জর ও দুঃখ-দুর্বহ হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে অসত্য নেই। পিতামাতার এ আশঙ্কা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং স্বাভাবিকও। কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করবার আছে। অভিভাবক-নির্বাচিত পাত্রে বিবাহিতা কন্যাকেও অনেকক্ষেত্রে ঐ পরিণতিশীল-দুঃখ ও বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়।

পিতামাতা সাধারণতঃ সদবংশ, আর্থিকসঙ্গতি কিংবা উপার্জনশক্তি, সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতা দেখে পাত্র নির্বাচন করে

থাকেন। তথাকথিত সচ্চরিত্র ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রও তার বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ ধরণের মনোবৃত্তি এবং বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা স্ত্রীর জীবন বিষময় করে তুলেছেন এমন একাধিক দৃষ্টান্ত অনেকেরই হয়তো জানা আছে।

অভিভাবক সাধ্যাতীত অর্থব্যয়ে ও বহু চেষ্টায় প্রকাণ্ড ধনীর ঘরে আদরিণী মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন দেখেছি। বিবাহের পরে উদ্‌ঘাটন হয়েছে, সেই ধনী পরিবার এমনই কঠোর কৃপণতায় অভ্যস্ত যে,—পিতৃগৃহে সযত্ন লালিতা কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দাসীসুলভ সর্ববিধ কঠিন গৃহকর্ম্ম করতে হয়। আজন্মের অনভ্যস্ত দরিদ্র সুলভ সামান্য আহার্য্যে সে জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হয়ে পড়ছে দিনের দিন। ধনী পরিবারের আভ্যন্তরীন কাহিনী প্রকাশ হওয়ার পর তখন হয় তো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অভিভাবকদের মনে করতে হয়েছে,—সাধারণ গৃহস্থঘর হলেও অকৃপণ দাক্ষিণ্যযুক্ত পরিবারে বিবাহ হলে হয়তো অনেক ভাল হত। সামাজিক উৎসবে মূল্যবান হীরার অলঙ্কার অঙ্গে তুলবার সৌভাগ্য না পেলেও, প্রাসাদের আড়ালে মেয়েকে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য যন্ত্রণা তিলে তিলে ভোগ করতে হত না।

এইরকম—বিদ্বান্ পাত্রকে কর্কশ গোঁয়ার, উচ্চ শিক্ষিত পাত্রকে নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন, ধনশালী পাত্রকে ঘোর কৃপণ হতে অনেক স্থলেই দেখা যায়। এই সকল দুর্ঘটনা অভিভাবকদের সতর্ক-নির্বাচনের মধ্যেই ঘটে থাকে বলা বাহুল্য। সুনির্বাচিত পাত্রে বিবাহ দেওয়ার পরে সে বিবাহ আশানুরূপ সুসার্থক না হলে তখন কন্যার ভাগ্য বা অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করেই সকলে সান্ত্বনা লাভ করতে চান।

মোটের উপরে দেখা যায় বিবাহের পরিণতি ব্যাপারটা নিয়তি-সাপেক্ষ। সচ্চরিত্র পাত্রে বিবাহ দেওয়ার পর সেই পাত্রকেই পরে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী হতে দেখা গেছে। সুতরাং বিবাহের পরিণতি ব্যাপারটা যে কোনও দিক দিয়েই হোক্ যখন কতকটা অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতেই হয়, তখন কন্যার নির্বাচনকে গ্রাহ্য করা একদিক দিয়ে যুক্তিসম্মত। বয়স্থা কন্যা বিবাহের পরে যদি দাম্পত্য জীবনে বা বিবাহিত পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজেকে অসার্থক বোধ করে, স্বামীর জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে চলতে না পারে বিবাহ তার স্বনির্বাচিত হলে, সেই সংঘর্ষের সামনে এসে নিজের দায়িত্ব স্বতঃঅনুভব করবার সম্ভাবনা বেশি। বিপরীতপক্ষে মনে হতে পারে, অসম মনোবৃত্তির স্বামী ও বিরুদ্ধ রুচির সংসারের মধ্যে তাকে টেনে এনে ফেলা হয়েছে। এই আরোপ করা অবস্থার সাথে তার নিজের যোগ কোথায় সুতরাং দায়িত্ব কতটুকু? এই রকম স্থলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বামীই তার নিজের নির্বাচিত হলে সেখানে তার Compromiseএর প্রবৃত্তি বা দায়িত্বজনিত সহিষ্ণুতা বেশি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে দুঃখ বহনের শক্তি অধিকতর বলিষ্ঠ হওয়ার আশা করা যায়।

এখনকার দিনে রক্ষণপন্থী ও উদারনৈতিক, ধনী এবং মধ্যবিত্ত, সকল শ্রেণীর বাপমাকেই দেখা যায় বেশির ভাগ স্থলে ইচ্ছা করেন, মেয়ে অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাশ করুক বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ুক! তারপর বিবাহের কথা। মেয়েকে ম্যাট্রিক, আই. এ, বি. এ, পড়াবার পরও তাঁরা সর্বতোভাবে আশা করে থাকেন—বাল্যবিবাহের কালের মতই তাঁরা সম্পূর্ণ নিজেদের রুচি ও ইচ্ছামত কন্যার বিবাহ দেবেন।

তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত ও দৃষ্টিকোণের সাথে, তাঁদের পরবর্ত্তী কালের মানুষ তাঁদের কন্যার রুচি ও ইচ্ছার যে কত পার্থক্য অবশ্যসম্ভব, তা' তাঁরা বিবেচনা করতে বিমুখ। এক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের অধিকারকে তাঁরা এত বাড়িয়ে ধারণা করেন যে, বহু স্থলে এর জন্য সন্তানকে এবং পিতামাতাকে প্রচণ্ড দুঃখ ও অন্তর্বিক্ষোভ ভোগ করতে হয়।

সন্তান মনে করে পিতামাতা পিতৃমাতৃত্বের অধিকারে বা পোষণকর্ত্তার অধিকারে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক হতে চাইছেন। পিতামাতা মনে করেন, অকৃতজ্ঞ সন্তান আমারই দাক্ষিণ্যে আমারই সাহায্যে যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করেছে, আজ সেই বিদ্যাবুদ্ধির হাতিয়ার নিয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিরোধ সন্তানে ও পিতামাতার মধ্যে নয়; বিরোধ, বিভিন্ন দুই যুগের বিপরীত দৃষ্টিকোণের শিক্ষা ও ধারণাবোধের। সন্তান অকৃতজ্ঞ নয়, পিতামাতাও উৎপীড়ক নন্—যুগ পরিবর্তনের ফলে দৃষ্টি পরিবর্তনে, আদর্শের এই সংঘর্ষ ও বিক্ষোভের উৎপত্তি। এর স্বাভাবিক অনিবার্যতা সম্বন্ধে

চিন্তা করে দেখলে অনেক ক্ষোভ ও দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হতে পারে।

অভিভাবকদের উপলব্ধি করার দিন এসেছে, তাঁদের যুগে তাঁদের শেখা রীতি নীতি বোধ,—ভালমন্দের মাপকাঠি, রুচি-পছন্দের দৃষ্টি আজকের যুগের মানুষদের কাছে সচল নয়। এদের নতুন দিক্ দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতা নতুন রুচির উন্মেষ হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যসমাজ দিনের দিন দ্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা রীতি নীতি সমস্তই দ্রুত পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আগের যুগে পঁচিশ বৎসর সময়ে যে-পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতো, আজকের যুগে সে-পরিবর্ত্তন আসতে পাঁচ বৎসরও সময় লাগে না। পরিবর্ত্তনের এই দ্রুতগামিতা ধীরগতি-যুগের মানুষের মন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এখানে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এমন কি ভাল বা মন্দের প্রশ্ন তুলেও লাভ নেই। মোটর বা এরোপ্লেন্ যতই ক্ষতি বহন করে আসুক, আজ পাল্কী বা গরুর গাড়ীকে ওদের পরিবর্ত্তে চালানো যাবে না। সুতরাং কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক্—আমাদের সন্তানসন্ততি যে বর্ত্তমানের ভাবধারাকেই গ্রহণ ও পাথেয় করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। এদেরকে অতীত আদর্শের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে বর্ত্তমানের মধ্যে অচল করে রাখার প্রয়াস কল্যাণজনক নয়। তবে, অতীতের যে-সকল আদর্শ ও ভাবধারা সর্বকালের সকল মানবেরই চিরন্তন আদর্শের সামগ্রী, সেই আদর্শ ও ভাব সমষ্টি সন্তান সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া পিতামাতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিজেদের জীবনের আচরণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে এবং সকলের উপরে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দিয়ে সন্তানের জীবনে ভাব ও আদর্শ সঞ্চারিত করা সম্ভবপর। কেবলমাত্র পিতৃমাতৃত্ব বা ভরণপোষণকারীর অধিকারে তাদের জীবনের উপরে আদর্শের প্রভাব বিস্তার করা সহজ নয়।

এখানে একটা কথা বলা হয়নি। অনেক স্থলে কন্যা (এবং পুত্রও) শিক্ষিত এবং বয়স্থ হলেও, বিবাহ ব্যাপারে অভিভাবকদের সুনির্বাচনের উপরই নির্ভর করে থাকেন। এটা খুবই ভাল এবং সুখের বিষয় নিঃসন্দেহ। এখানে কোনও সমস্যা ওঠে না। সুতরাং অভিভাবকদের দায়িত্বেরও প্রশ্ন ওঠে না। তাঁদের নির্বাচিত পাত্র বা পাত্রীতে পুত্র বা কন্যার বিবাহের ফল সার্থকসুন্দর হয়ে না উঠলেও, তাঁদের বিবেকের কাছে জবাবদিহির কিছু থাকে না। কারণ তাঁরা তাঁদের জ্ঞান বিবেচনা অভিজ্ঞতা এবং শুভবুদ্ধি অনুসারে নির্বাচন করেছেন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর স্বকীয় মত বা রুচি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধেই আমি এই আলোচনা করেছি।

রাষ্ট্র ও নারী

শ্রীপ্রভাবতী বসু

সংসারে নারীর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। প্রত্যেকের ঘর-সংসারের কথাই আমি বলিতেছি। সেখানে সে কর্ত্রী; সে কর্তৃত্ব নিজের পদাধিকার বলেই করে এবং তাহা অবিসম্বাদী। যখন দশজনের সংসার লইয়াই রাষ্ট্র তখন সেখানেও নারীর বিশিষ্ট স্থান ও অধিকার স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

ইতিহাসের নজির উল্লেখ করিবার মত বিদ্যার দৌড় আমার নাই। নারীকে লইয়া রাষ্ট্রের উত্থানপতন হইয়াছে এ কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। ছেলেদের বইয়ে পড়িতে শুনিয়াছি, একটী কিশোরী যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়া ফরাসী জাতিকে ইংরাজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিল; একটি মহীয়সী নারীর রাজত্বকালই ইংলণ্ডের

ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, দেশহিতব্রতে তিনি চিরকাল অবিবাহিতা ছিলেন; রাণী অহল্যা বাঈ দেশের স্বাধীনতার জন্য অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর বেশী অনধিকার চর্চা করিতে চাই না। কর্মজীবনে মাতা বা পত্নীর প্রভাব অনেকানেক রাষ্ট্রনায়কই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। সমসাময়িক ইতিহাসেও রাষ্ট্র ও পৌর ব্যাপারে নারীর দান অকিঞ্চিৎকর নয়, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ইহাই পড়িয়া আসিতেছি। সুতরাং নারীর অধিকার, যোগ্যতা বা পারদর্শিতার কথা লইয়া কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া মনে করি না।

রাষ্ট্র ও পৌর ব্যাপারে নারীর অধিকারের উল্লেখ করিয়া আমি রেষারেষি বা ঠেলাঠেলির কথা তুলিতে চাই না। একদিকে যেমন নারীর ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখার কোন অর্থ হয় না, অপরদিকে চুলচেরা সমান অধিকারের দাবী লইয়া কৌদল করাকেও খুব বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, যে স্বল্পসংখ্যক নারী রাষ্ট্র কার্যে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই অভিজ্ঞতার কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পিতা ভ্রাতা বা স্বামীপুত্রের নিকট হইতে সহানুভূতি না পাইলে তাঁহাদের সর্ববিধ প্রচেষ্টা ত ব্যাহত হইতই, পরন্তু জীবনও দুর্বিষহ হইয়া উঠিত। আমার নিজের কথাই বলিতে পারি। ১৯৩০ সনে ময়মনসিংহে "রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতির" প্রতিষ্ঠা হইয়া উহার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। আমার স্বামীর অনুপ্রেরণা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা না পাইলে আমার পক্ষে দেশসেবার সৌভাগ্য হইত না। সমগ্রভাবে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া কোন মহিলা প্রতিষ্ঠান অন্য কোথাও স্থাপিত হইয়াছিল কিনা জানি না। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রে ইহার বিধান ছিল না, সম্ভবতঃ এখনও নাই। কিন্তু "মন্দিরাকে" ঘেরিয়া আজ নারীর রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। "অল্ ইণ্ডিয়া উইমেন্স্ কনফারেন্স" তখন ছিল কিনা শুনি নাই; থাকিলেও তাহা আভিজাত্যের আওতায় বাক্‌বিলাসে পর্যবসিত ছিল; বর্তমানের বলিষ্ঠ কর্মনীতি ও ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। যাহাই হউক তৎকালে ময়মনসিংহের "রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি" যে শক্তি, সংহতি সফলতা অর্জন করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই শ্লাঘনীয়। আমাদের ন্যায় অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যথোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইবে না ইহা আমি ভাবিতেই পারি না।

ঘরকন্না ব্যাপারে নারীর কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে নারী ও পুরুষের কর্তৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বরং পরস্পরের অধিকার সাপেক্ষ কর্তৃত্বের সামঞ্জস্য দ্বারাই তথায় সর্ববিধ কাজ শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সুনির্বাহ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি দশটা সংসার লইয়াই রাষ্ট্র সুতরাং রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এই নীতির সম্প্রসারণে কোন অলঙ্ঘ্য বাধা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বিশ্বসৃষ্টির দ্বৈবিধানে নারীর যে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সে সহনশীলতার মধ্য দিয়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা যেমন পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আত্মত্যাগ নারীর পক্ষে তেমনি সহজাত। কিন্তু এ দুয়ের কোনটাই বলহীনের ধর্ম নয়, এ কথা উভয়কেই মানিয়া লইতে হইবে। কর্ম বিভাগ যেমন স্বাভাবিক ও অপরিহার্য, তেমনি তাহার মর্যাদা সম্পর্কে সমুচিত উদার ভাব পোষণ করিলে বিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। যে যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং যুদ্ধরত, আর যাহারা তাহার অস্ত্র, আহার ও রসদ যোগায় তাহারা তুল্যরূপেই দেশের সেবা করে, এই সহজ সত্য যখন সকলের উপলব্ধি হইবে তখন কর্মবিভাগের নিমিত্ত কাহারও প্রতিই আর অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সম্ভব হইবে না। পুরুষকে যেমন "গৃহিণী-সচিব-সখা" রূপে নারীর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে, নারীকেও তেমনি যোগ্যতা দ্বারাই নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে। রাষ্ট্রে নারীর স্থান নির্দেশ করিতে তখন কাহাকেও আর বেগ পাইতে হইবে না।

চীন নারী ও যুদ্ধ

শ্রীরেবা ঘোষ

চীনা সমাজে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত নারীর অধিকার প্রাচীন লৌকিক সংস্কারে খর্ব্ব হয়েছিল। ১৯২৬-২৭ সালে জাতীয় আন্দোলনের যে তরঙ্গ সমস্ত চীনকে প্লাবিত করে, তার ফলে চীনের লুপ্ত নারীশক্তিও জাগ্রত হয়ে ওঠে। জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে নারী ভলান্টিয়ার বাহিনী শত দুঃখ কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা বরণ করে দেশমুক্তির সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছে। চীনের এই নারী জাগরণে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে সুং ভগ্নীদ্বয়ের কথা। এদের মধ্যে প্রথমা হলেন ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পত্নী। স্বামীর সহধর্ম্মিনী হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে সর্ব্বতোভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের কর্ম্মনীতির প্রেরণা সম্বল করে কাজ করে চলেছেন। বর্ত্তমানে শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলনের তিনি অন্যতমা সংগঠনকর্ত্রী। সমস্ত চীনের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয়া।

সুং ভগ্নীদ্বয়ের দ্বিতীয়া যিনি, তিনিই আধুনিক চীনের জননায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেকের পত্নী। চীনের বহু সামাজিক আন্দোলনের তিনিই প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষায় সম্পন্না চীনের এই নারী প্রতিভা বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় সঙ্কটে স্বামীর সহচরীরূপে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতির জটিলতার মধ্যে মুক্তিকামী চীনের সকল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বার করাই তাঁর জীবনের সাধনা।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বহুদিক থেকেই মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছে; বাস্তবিক পক্ষে এবারকার যুদ্ধ মহাযুদ্ধ বা Great war-ই বটে।

বর্ত্তমানে বিমানপথে সংগ্রাম এমন সীমায় এসেছে যে রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে অবস্থিত বেসামরিক নর-নারী নিজেদের আর নিরাপদ বলে মনে করতে পারে না। শত্রুপক্ষের দূর-পাল্লার বোমারু-প্লেনগুলি যে কোন সময়ে এসে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিস্তার করতে পারে, আর এই অনিষ্ট ও ক্ষতি প্রতিনিয়তই ঘটছে। সেজন্য নারীও আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগদান করছে। নারী যে কেবল মাত্র অন্তঃপুরের ক্রীতদাসী নয়, বহির্জ্জগতেও যে তার অনেক কিছু করণীয় আছে, তা এবারকার বিশ্বসংগ্রামে নারী যথাসাধ্য যোগ্যতার সাথেই প্রমাণ করেছে। তাই দেখা

সুং ভগিনীদ্বয়

যায় চীন নারী দুর্জ্জয় পণ করে দেশপ্রেমিক তরুণ যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে আজ তাদের দেশশত্রু মদগর্ব্বিত জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। চীনানারী কেবলমাত্র আহতদের সেবা-শুশ্রূষা আর যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পরোক্ষে সহায়তা করেই সন্তুষ্ট থাকেনি; যথারীতি যোদ্ধার বেশ ধারণ করে তারা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধও করছে। বৈমানিক-রূপে ও অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলিচালনায় চীনের নারীসৈনিক জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

কারখানার সামরিক শ্রমশিল্পের, রেডক্রশ সমিতিতে, শুশ্রূষা শিবিরে, জাতীয় চীনের দেশরক্ষা আয়োজনে সর্ব্ববিধ

উদ্যোগে চীনা নারী আজ চীনা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে চীননারীর অধ্যবসায় নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগ অতুলনীয়। চীনের Y.W.C.A. নারী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নিত্য নতুন পথে চীনের ইতিহাসকে গড়ে তুলছে। সৈন্যবাহিনীতেও চীনা নারী ভর্ত্তি হয়েছে দেখা যায়।

বর্ম্মা রোড থেকে সুরু করে চীনা শিশুদের শিক্ষা, এর প্রতিটি পর্য্যায়ে চীনা নারীর দান উল্লেখযোগ্য। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র মাদাম চিয়াং কাইশেকের প্রভাবে। শুধু যুদ্ধের পরেই নয় তার বহু আগে থেকে এক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম বিস্ময়কর। গত ছবছর যুদ্ধের মাঝে তারা তাদের সামাজিক চেতনাবুদ্ধির বিকাশ সাধন করেছে এবং তারই প্রেরণায় আজকের এই পৈশাচিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের এই অবিচলিত মনোভাব, অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের মূল্য সকলেরই স্বীকার্য্য।

যুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৩৭ সনের কাছাকাছি সময়ে যখন দেখা যেত যে বহু ভদ্রঘরের মহিলারা চীনা নারীরক্ষী অথবা স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে পথে পথে ঘুরে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে অসহায়কে আশ্রয় দিচ্ছে—তখন

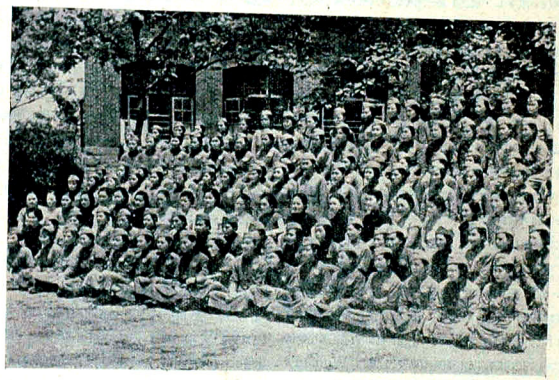

চীনা নারীবাহিনী

ছিল অপরিসীম, উৎসাহ ছিল অদম্য। সমগ্র জগতে এই চীনা রমণীদেরও যে একটা স্থান আছে এবং তারা যে সত্যিই তাদের দেশকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, বোধ করি তা প্রমাণ করবার জন্যই তাঁর এ অতুলনীয় প্রচেষ্টা।

সাংহাই অবস্থিত কিংবা সুদূর প্রবাসে স্থিত কতিপয় ধনী ছাড়া চীনা রমণীরা এই মহাযুদ্ধে তাদের জীবনকে সর্ব্বদিক দিয়ে উন্নত করবার জন্য যে ক্লেশ স্বীকার করছে তা অনেকেই একটু অবাক হতেন কিন্তু আজ তার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখলে আশার আলো দেখা যায়। আজ প্রায় ৭৯,০০০ মহিলা রক্ষী দেখা যায়, যাদের মধ্যে ৩,০০০ মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে নানা কর্ম্মে লিপ্ত।

মিস লিউ-টিসিং-ইয়াং-এর তত্ত্বাবধানে চীনে যে Women's Advisory Committee গড়ে উঠেছে তা থেকে মেয়েদের জন্য নানাভাবে training classএর বন্দোবস্ত করা

হয়েছে। এই কমিটির সভ্যদের অন্ততঃ পক্ষে সাধারণ মধ্যম স্কুল বিদ্যা এবং কিছু অভিজ্ঞতা থাকা চাই, অবশ্য এর মধ্যে অনেকেই আবার তাদের কলেজের শিক্ষাও শেষ করেছেন, এবং কেউ কেউ আবার সামাজিক কর্ম্মে খুবই দক্ষ। স্বাধীন চীনের প্রতি জায়গা থেকে মেয়েরা আসে এখানে শিক্ষা নেবার জন্য এবং তা শেষ হয়ে গেলে আবার তাদের স্ব স্ব স্থানে চলে যায় কাজ করার উদ্দেশ্যে।

এই সব ছাত্রীরা স্থানীয় কুয়োমিংটাং এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সঙ্ঘ দ্বারা কিংবা তাদের স্থানীয় মহিলা সমিতি দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকে। তাদের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই তাদের যাতায়াতের যাবতীয় খরচা বহন করে।

এই শিক্ষার সময়ে তারা বহু জ্ঞানী ও প্রকৃত পণ্ডিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞ অতিথি বক্তাদের শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়। মাদাম চিয়াং কাইসেক স্বয়ং এই সব কাজের পরিচালনা করেন। তিনি ছাত্রী এবং মহিলাদের যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে সরলভাবেই তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। নানা দিক দিয়ে তারা তাদের উন্নত করে তোলে। তারা গান বাজনাও শেখে আবার আর একদিকে Co-operative Societies পরিচালনার ভার নেয় এবং বিশেষ করে যোদ্ধাদের পরিবারের সাহায্যার্থে বয়নশিল্পের কাজে সহায়তা করে। তারা স্বাস্থ্য, সেবা, জনহিতকর কাজ, রাজনৈতিক প্রচার-কার্য্য—প্রতিক্ষেত্রেই শিক্ষা লাভ করে। শিশুসন্তান লালন পালনের ভারও তাদের হাতে। ফলে তারা শিক্ষার পরবর্ত্তী জীবনে নিজেরাই শিশু সেবায়তন প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় অপরাপর মহিলাদের নিয়ে একযোগে কাজ সুরু করে দেয়। Women's Advisory Committeeর Rural Work Department খুব শিগ্‌গিরই খোলা হয়েছে—বোধকরি তা একটু ভালভাবে গড়ে উঠেছে ১৯৩৯ এর অক্টোবরে। এই বিভাগের সাধারণ সম্পাদিকা হলেন মিসেস লি।

এই বিভাগ এক একটি দলকে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় গ্রামে গ্রামে। এই বিভাগের কাজ হলো যুদ্ধজনিত দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তার সমাধানের ব্যবস্থা করা। এর ওপরে আছে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে গঠন-কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে শেখানো এবং সেই দিক দিয়ে তাদের উন্নত করার সাথে সাথে তাদের জন্য Farms এবং Factories এর প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া।

আপাততঃ এই বিভাগে ১৩টি দল আছে। প্রত্যেকটি দলে ১৫টি থেকে ২৫টি কর্ম্মী এবং একজন Supervisor থাকে। এরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখেই কাজ করে, এরা মহিলাদের জন্য দু-প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা করেছে। একটি অশিক্ষিত মহিলাদের জন্য, অপরটি কয়েকজন বাছাইকরা শিক্ষিত মহিলাদের জন্য। এই গুটিকয়েক শিক্ষিত মহিলাই আবার শিক্ষালাভ করে পরে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে এক একটি দল গড়ে তোলেন। এখন এই সব দলের এক একটি ক্লাশে প্রায় ৮০০ শত করে মহিলা শিক্ষা লাভ করছেন। এই সব গ্রাম্য দলের সভ্যরা খাওয়া, থাকা, ওষুধের খরচ এবং যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি সবই পায়। এছাড়া Women's Advisory Committee এদের আবার কিছু কিছু বেতনও দিয়ে থাকে।

ছাত্রীরা যখন যেরকমভাবে সুবিধে সেই রকমভাবেই অতি অগম্যস্থান অতিক্রম করে চলে। কখনও বা দেখা যায় তারা পায়ে হেটে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে কখনও বা তারা বেরাকেই রাত কাটায়—এমন কি প্রয়োজন হলে তা তারা নিজেরাই তৈরী করে নিতে দ্বিধা করে না।

শিক্ষকতার ভার যারা নেন্ তাদের মধ্যেও অধিকাংশ মহিলা। পাঠ্যপুস্তক, কাগজ—ইত্যাদির অভাব বিশেষ করে ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম হয়ত বা মোটেই পাওয়া গেল না তবুও তারা ক্ষুণ্ণ হল না, অতি সামান্য যা জিনিষ পান তাই দিয়েই শিক্ষকতার কাজ সমাধান করেন অতি সুনিপুনভাবে।

তাদের মধ্যে যে প্রচার বিভাগ আছে তার অধিকাংশ সভ্যই অবসর সময়ে ছাত্রী। তারা বাসে করে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে গিয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচার করে, এই সময় মিতব্যয়িতার পরিচয়স্বরূপ সেই বাসই তাদের Platform হিসেবে কাজ করে।

স্বাস্থ্যবিভাগও আবার কখন কখন এই ভ্রাম্যমান দলের সাহায্য নেয়। শারীরিক এবং সাংসারিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলীও তাদের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয় এই বিভাগের দ্বারা। উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য কর্ম্মীরা বড় বড় রং করা পোষ্টারের সাহায্যে নাটকীয়ভাবে এই কাজ করে থাকে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীনে আজ যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গরিলাবাহিনী। এরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করে না, নিজেদের ঘরের আশে পাশেই তাদের কর্ম্মক্ষেত্র। মহাচীনের এই রণনীতির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অধিনায়িকা ৬৭ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাদাম চাও উ তাং। এই বীরাঙ্গনা মহাচীনের জনসাধারণের নিকট বিরাট "মামা মস্কুইটো" নামে সুপরিচিতা। গরিলাবাহিনীর বেশীর ভাগই ছাত্রী—তারা একই আদর্শের প্রেরণায় আজ জাতীয় একতায় আবদ্ধ। শোনা যায় এই সব ছাত্রীরা নাকি রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র চীনাবাসীদের অনুপ্রাণিত করছে এই নৃশংস বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে। এই মহিলাদলের একটি নাকি নানিং চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্রস্থানের অধিবাসীদের একসময় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরিয়ে নিয়েছিল এবং চীনা সৈন্যদের সরে আসার পরেই নাকি সমস্ত রাস্তাঘাট নষ্ট করে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

এই সব ছাত্রীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্য করছে, কেউ বা পর্ব্বতে লুকানো জায়গা থেকে অধিবাসিদের পুনরধিকৃত স্থানে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করছে, কেউবা আবার যোদ্ধা এবং অধিবাসিদের মধ্যে একটি সহজসরল নিবিড় সংযোগ করার জন্য চেষ্টা করছে। তারা অধিবাসীদের মধ্যে যে কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তার করছে তা নয়—সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞানের অপরিস্ফুট চেতনাবুদ্ধির বিকাশ সাধনে বিশেষ তৎপর। তারা আজ বুঝতে শিখেছে যে স্বাধীনতারক্ষার মূলে থাকা চাই চীনা পুরুষ এবং নারীর সম্মিলিত শক্তি ও প্রচেষ্টা—তাহা না হইলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়ে উঠবে সুদূর পরাহত।

(আগামীবারে সমাপ্য)

From Bina Das,
Security Prisoner.
Presidency Jail, Calcutta.

To
Sj. Beni Madhav Das.
Ballygunge.

শ্রীচরণেষু বাবা—

তোমার "কালকের" লেখা চিঠি "আজ" পেলাম! এটা কিসের লক্ষণ? ব্যবধান বা দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসার কি? —"স্থান কালের" তুচ্ছতা ও অলীকতা হয়তো দার্শনিকদের কাছে খুবই স্পষ্ট, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের ওপর তাদের প্রভাব অনেকখানি; তাই এই চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে সময়-সংক্ষিপ্তটুকু আমাকে স্পর্শ করে, মনে হয় বাবার কত কাছে রয়েছি বুঝি!

চিঠিরা আজকাল অস্বাভাবিক রকম গতিশীল হ'য়ে উঠেছে —অন্ততঃ বাইরে থেকে যেগুলো আসে সেগুলো। আমাদের চিঠিরও পাল্লা দিয়ে ঠিক অতখানি যাওয়া উচিত। কিন্তু যায় কি? এথেকে বোধ হয় সহজেই moralise করা যায় —জেলে আসা যত সহজ জেল থেকে বেরুনো তত সহজ নয়।

তোমার চিঠিতে এগারই মাঘের তোমার Sermonএর সারাংশ পেয়ে খুব ভালো লাগল, আমি তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার দৃষ্টি সবগুলো যোগ করে নিলুম মন থেকে। সংস্কৃত শ্লোকটা খুব সুন্দর,—সত্যিই জীবনে প্রতি পদে কত দ্বন্দ্ব।—ওই যে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রায়, দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেবার প্রয়োজন হয়। আমাদের সেই দুইয়ের একটা হয়তো শ্রেয়ের, অন্যটা প্রেয়;—প্রেয় আপাতরমণীয়, আকর্ষণও তার বেশী। কিন্তু শ্রেয়কে যদি বরণ করে নিই, তাহলে সমস্ত অন্তর গান গেয়ে ওঠে,—অমৃতের প্লাবনে হৃদয় ভরে যায়—যদিও আপাতদৃষ্টিতে বড় কঠোর শ্রেয়ের রূপ। ওই শ্রেয়কে সম্বোধন করেই বুঝি আমাদের কবি বলেছেন—

"এতো মালা নয় গো; এযে তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র হেন ভারী।"

কিন্তু বাবা তবু এও মনে হয় জীবনের সত্যিকারের যা

প্রেয়, যা Pleasant, যা রমণীয় তার সঙ্গে বোধ হয় শ্রেয়ের কোনও প্রভেদ নেই—কল্যাণ আর সুন্দরে বিরোধকে সত্য হতে পারে? "কল্যাণ যদি হয় সমাজের ভিত্তি, সুন্দর যে হচ্ছে তার অভ্রভেদী চূড়া।" আমার তো মনে হয় শ্রেয় প্রেয় সবই questions of degrees, সত্যরই বিভিন্ন স্তরের প্রকাশ,—ছোটবেলায় শিশুর হাতের রঙীন খেলনা তার অনেক কিছু, একটু যখন বড় হয় তখন খেলনা ফেলে দিয়ে সে ছবির বইএ মন দেয়—পড়াশুনা তার ভালো লাগে—তখনও একভাবে বলা যায় প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে সে বেছে নিল—কালকের প্রয়োজন আজ তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় ও প্রেয়র মাঝে প্রকাণ্ড বড় মিল দেখতে পেয়েছিলেন,—তাই তো কর্ত্তব্যের শুষ্ক-বীথিও তিনি এমন করে ফুলে ফুলে ছেয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর কথা—

"দেবতারে যাহা দিতে চাই তাই দিই প্রিয়জনে
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই দিই দেবতারে,
আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।"

আমি নিজে তো মনে মনে এমনি করে শ্রেয় ও প্রেয়কে এক করে দেখি—তাতে কর্ত্তব্যবোধ যেন অনেকটা মধুর ও সহজ হয়ে ওঠে মনে হয়। তোমার কি মনে হয় লিখো।

আজ কাগজে পড়ছিলুম কবির প্রার্থনা—

"বীর্য্য দেহ দুঃখে
যাতে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে,...বীর্য্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি।"

কিন্তু বাবা আমার মনে হচ্ছিল—মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের এ ধরণের "বীর্য্যের জন্য প্রার্থনা" করবার আর প্রয়োজন কতটুকু! স্বকীয় তেজোবহ্নিতে তাঁরা তো নিয়তই উদ্ভাসিত, তাদের দুঃখে কতটুকু অভিভূত করতে পারে 'প্রাত্যহিক তুচ্ছতার' বহু ঊর্দ্ধেই তাঁদের অবিচল প্রতিষ্ঠা। কবি এ লাইনগুলি লিখেছেন একান্তভাবে আমাদের মত অতি সাধারণ ব্যক্তিদেরই স্মরণ করে—আমাদের মত লোক যাদের প্রতিমুহূর্ত্তে দৈনন্দিন জীবনের অজস্র ধুলিজাল আচ্ছন্ন করে রেখে দেয়—দুঃখের প্রবল ঝাপ্টায় যারা বারে বারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—তবু যারা মনুষ্যত্বের অভীপ্সা ছাড়তে পারে না, নূতন সৃষ্টির স্বপ্ন মনের গোপনে লালন করে চলে—স্পর্দ্ধা রাখে এগিয়ে যাবার—'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করে। এই একান্ত তুচ্ছ, একান্ত অসহায়, একান্ত দুর্ব্বল, বহুপরিমাণে পঙ্গু—অথচ মনুষ্যত্বের গভীরতম বিপুলতম আদর্শের হাতছানিতে ঘরছাড়া মানুষগুলিকে ভেবেই কবি প্রার্থনা করেছিলেন "বীর্য্যের"—যে বীর্য্যের অভাবে এদের সব সাধনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়—স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়—এগিয়ে চলা আর হয় না। কবি তাঁর অন্তর্গূঢ় কামনার সুর ছড়িয়ে রেখে গেছেন—আকাশে বাতাসে,—সেই কামনা একদিন মূর্ত্ত হবে—এক দিন ঘরে ঘরে জন্মাবে কবির মনের মানুষগুলি—"বীর্য্যের" দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে। আমরা তাদের দেখে যাবো কি? হয়তো দেখবো না—আমরাও শুধু কবির কামনার সঙ্গে আমাদের নিগূঢ় কামনা মিলিয়ে দিয়ে যেতে পারব শুধু।

—আজ শেষ করি বাবা। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার মনু

বাংলার আর্ত্তত্রাণ প্রসঙ্গ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

নিঃশব্দে পাথর খসাইতে খসাইতে পাহাড়িয়া জলস্রোত যখন প্লাবনের পথ তৈরী করিতেছিল, তখন অনেকেই টের পায় নাই, অনেকে জানিয়াও না জানার ভাণ করিয়াছে। তার পর অকস্মাৎ দুর্ভিক্ষের প্লাবন তীব্র জলপ্রপাতের বেগে ঝাঁপাইয়া আসিল। বাংলার সীমতলক্ষেত্র ডুবিল। কিন্তু একথাও সত্য যে, দেশের মানুষের কাছে বিপদের সিগন্যাল যখন পৌঁছিল, তখন তাহারা জড় হইয়া বসিয়া থাকে নাই। সাহায্যদানের আবেগ, টাকার স্রোত, দুর্গতির উদ্ধারের জন্য প্লাবনের মতই চারিদিক্ হইতে হু হু করিয়া আসিয়াছে। যে-দেশের জনসাধারণের হাতে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের কোনও অধিকার নাই, সে ইহা ব্যতীত আর কি প্রতীকার চেষ্টা করিবে?

বাংলার এই অভাবনীয় সঙ্কট কেন আসিল এবং অবসান কেমন করিয়া হইবে, সে প্রশ্ন খ'তাইতে বসিলে যেখানে গিয়া পৌঁছিব, সেদিক দিয়া আজ যাইব না। কেননা, সে আলোচনা বর্ত্তমানে হয় নিষিদ্ধ, নয় নিষ্ফল হইবে। সে গোড়ায়-গলদের কথা কংগ্রেস বহুদিন ধরিয়া দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছে; এবং বুঝাইতে গিয়া ও প্রতীকারের পথ খুঁজিতে গিয়াই আজ কংগ্রেসের মুখ বন্ধ। অতএব থাক্। সরকারী যন্ত্রের চাবিকাঠিটি ছিনাইয়া আনিতে না পারিলে বাঙ্গালী জাতির তথা সমগ্র ভারতজাতির আর বহুদিন বাঁচিবার ভরসা নাই, ইহা হয়তো অনিবার্য্য সত্য। কিন্তু তাহা যতদিন না পারি ততদিন আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তির সাহায্যেই আধমরা দিনগুলির আর্ত্তি যতটা উপশম করা যায়, তাহাই করণীয়। মানুষের ঘরে রোগী যখন চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া যায়, তখন "বাঁচিবে না" বলিয়া আত্মীয় পরিজন তো তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় না, মরণের ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাশভরা স্নেহ লইয়া সেবা যত্ন করিয়াই যায়! আমাদেরও সেই অবস্থা।

রাজনীতিক কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকের হয়তো ধারণা আছে, এই রকম সঙ্কটমুহূর্ত্তে 'রিলীফের' বৃথা প্রলেপ বুলাইয়া জনগণকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা অসঙ্গত। তার পরিবর্ত্তে জীবনের চরম জ্বালা যে পেটের জ্বালা তাহাতেই ইন্ধন জোগাইয়া বিক্ষুব্ধ জনগণকে বিপ্লবের পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে ইহাই উপযুক্ত মুহূর্ত্ত।—থিওরির দিক দিয়া সেকথা বোধহয় সত্য। কিন্তু যখন বাস্তবক্ষেত্রে এই বুভুক্ষু জনতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, নিরাশায় স্তব্ধ হইয়া যাই। দেখি, তাহাদের মুখে চোখে প্রতিশোধ লইবার হিংস্র দৃঢ়তার লেশ মাত্র নাই, আছে "ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী!" অন্যায়ের প্রতিবিধান চেষ্টা দূরের কথা, এ অন্যায়ের উৎস কোথায়, দায়ী কাহারা তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা অদৃষ্টকে দোষারোপ করিয়া তিলে তিলে মরিবে, কিন্তু অত্যাচারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মারিয়া মরিবে না। কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী ধনিকতন্ত্রের এই তো মহিমা! তাহা জার্ম্মান বা জাপানীর মত নগ্ন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে মানুষকে হত্যা করে না; পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, চুম্বন করিতে করিতে রক্ত চুষিয়া খায়! নিষ্পিষ্ট জীবটি কতক্ষণে তাহার স্বরূপ চিনিতে পারে, তখন আর প্রতিরোধ করিবার মত উদ্যম তাহার দেহে অবশিষ্ট নাই। তাই যদি না হইত তো, ভারতবর্ষ আজ তাহার ইতিহাসের সর্ব্বগভীর তমসার রাত্রে নিঃশব্দে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া কাঁদিত না, বহু-পূর্ব্বেই নূতন উষার সঞ্চার ত হইত। ক্ষুধার তাড়নায়, যুদ্ধের তাড়নায় ফরাসী বিপ্লব ও রুষ বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ অনড়। দোষ কাহাকে দিব জানি না। কিন্তু যাহারই হউক, ঘটনা যখন ইহাই, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষগুলিকে দিনের পর দিন মরিতে দিয়া লাভ নাই।

সুতরাং রিলীফ যথাসাধ্য দিতেই হইবে।

কিন্তু এই সাহায্য কিরূপভাবে বিতরণ করিলে মঙ্গলের পরিমাণ কতটা বেশী হয়, তাহাই ভাবনার কথা। ধনিক ভারতবাসীর ও বিদেশবাসীর ভাণ্ডার হইতে টাকার স্রোত কম আসে নাই, উৎসাহশীল কর্ম্মীরও অভাব ততটা নয়। তথাপি সমস্যাটি এত বহুব্যাপক এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিবার তাগিদ এমন আচম্‌কা আসিয়াছে, যে নানা দিক্ দিয়া কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ওঠা স্বাভাবিক। সমস্যার একদিক মিটাইতে গিয়া অপর দিকে নূতন সমস্যা দেখা দেয়।

তাই দেখিয়াছি,—

চাউলের দর অস্বাভাবিক গতিতে বাড়িতে আরম্ভ করিলে পর সরকারী তরফ হইতে আসিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অডিন্যান্সের পর অডিন্যান্স। কিন্তু ইহার ফলে চাউল যে চোখের সাম্নে হইতে একেবারেই উধাও হইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদের মাথায় আসে নাই। উপবাসী ভিখারীকুলকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখার ভাণ করিয়া তড়তড় করিয়া দেশময় খিচুড়ীকেন্দ্র গর্জাইয়া উঠিল। কিন্তু অনাহারী বাঙ্গালীর মরাপেটে জোয়ার বহ্‌বার অপূর্ব্ব প্রবাহ যে প্রবাহিকা ও কলেরার জোয়ার নামাইবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নাই। অন্ততঃ পক্ষে তজ্জন্য যে পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসক, শুশ্রূষক, হাসপাতাল ও ঔষধের ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা উচিত ছিল, তাহাও খেয়াল হয় নাই। ঔষধপত্র যতদিনে আসিতেছে নরনারী শিশুগণ ততদিনে মরিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেই দুইচারিদিনে দেখিয়া শিখিয়াছেন এবং খিচুড়ীর পরিবর্ত্তে শুকনা চাউল ও আটা বিতরণ করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির দিক দিয়া অধিকতর উপকারক হইয়াছে। তা ছাড়া যেদিকটি গভর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই দিককে বিশেষভাবে সাহায্যদান করিয়াছে—অর্থাৎ বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীকে। গভর্ণমেণ্টের খিচুড়ীরূপ আশীর্ব্বাদন বর্ষিত হইয়াছে শুধু তাহাদেরই শিরে, যাহারা ভিখারী (পেশাদার না হইলেও দুর্ভিক্ষের ধাক্কায়), যাহারা কলিকাতার বা মফস্বল শহরগুলির রাজপথে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যাহাদের না সরাইলে বা না ব্যবস্থা করিলে পৃথিবীর চক্ষুর সম্মুখে ধিক্কৃত হইতে হয়। কিন্তু যাহারা আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য গৃহতলে উপবাসে মরিয়াও ভিক্ষায় পথে বাহির হয় নাই, তাহাদের সংবাদ সরকার লইতে চাহে নাই, বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থাও করে নাই। তাঁহারা যাহা কিছু বাঁচিয়াছে তাহা এই বেসরকারী ব্যবস্থার জোরে। কিন্তু ইহাতেও নূতন ভাবের সমস্যার সূচনা দেখিতেছি—ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে গৌণভাবে ভিক্ষাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একে তো বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড বহুদিন যাবৎ শিথিল হইয়া আসিতেছিল; আজ মাসের পর মাস এইভাবে অপরের দান গ্রহণ করিতে করিতে সে আরও অলস, অকর্ম্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এ অতি সর্ব্বনাশের লক্ষণ।

এইরূপে সমস্যা বহুমুখী।

দ্বিতীয় কথা, প্রায় প্রত্যেকটি সাহায্যকেন্দ্রই ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাহায্যদানের অভিপ্রায় লইয়া কাজে নামিয়াছিলেন। আশা, আমন ধান বাজারে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ক্রমশঃ কিছু স্বাভাবিক হইয়া আসিবে, আর রিলীফের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু সত্যই কি তাই? ধরাই গেল, চাউলের দর ১০৲ টাকায় নামিয়াছে, তাহাতেই কি বাংলার জীবন-সমস্যা সহজ হইল? এই বৎসরাবধি দুর্ভিক্ষের করাল নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে আজ ১০৲ টাকা দরের চাউল খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন পরিবার কয়টি আছে? যে সমস্ত চাষী-মজুর শ্রেণীর পরিবার দুর্ভিক্ষের দায়ে জমা-জমি ভিটা-মাটি বেচিয়া উৎসন্ন হইয়া পথে ঘুরিতেছে, চাউল ১০৲ টাকায় নামিলেই তাহারা আবার তখনই আগের জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে কি? যে সকল শিশু অথবা নারী অনাথ হইয়া পড়িয়াছে, পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ১০৲ টাকা না হইয়া চাউল ৮৲ টাকা হইলেই বা তাহাদের কি হইবে? অতএব বুঝা যাইতেছে, দুর্ভিক্ষের ছায়া সহজে মুছিবার নয়, বহুদিন ধরিয়া ইহা আমাদিগকে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিবে।

এইসব গুরুতর বহুব্যাপক সমস্যাগুলি মিটাইতে গেলে দেশের গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই, জানি। তথাপি যে সকল সমিতি বা ব্যক্তি বর্ত্তমানের সাহায্যবিতরণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাও অবশ্যই স্বীয় ক্ষুদ্র সীমানার

মধ্যে আপন আপন কর্ম্মধারা সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। মনে হয়, তাঁহারা যদি আগামী বৎসরের জন্য নূতনভাবে সাহায্য দানের নীতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন, তবে ভালো হয়। বাজার সস্তা হইলে যে সব মানুষ বাঁচিয়া গেল তো গেলই; বাকী যাহারা, তাহাদের ভাগোর হাতে ছাড়িয়া দিবার, অথবা পুনরায় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য খিচুড়ীপঙ্‌ক্তিতে বসাইবার চেষ্টা না করিয়া স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ দিতে পারিলে বেশী কল্যাণকর হয়। ভিক্ষাদানের পালা সাঙ্গ হউক, তার পরিবর্ত্তে এবার কাজের পথের প্রবর্ত্তনা হউক। যে অর্থ, উদ্যম ও পরিশ্রম এই কয়মাস ধরিয়া দরিদ্রভোজনের কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, সঙ্কটের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে তাহা যদি কৃষি ও শিল্পের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির পক্ষে অধিকতর কল্যাণ প্রসব করিবে। এইসব কেন্দ্রের পরিশ্রমে বাংলার খাদ্যসম্পদ ও অর্থসম্পদ তো বাড়িবেই বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় লাভ, বাঙ্গালী তাহার আত্মসম্মানবোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা ফিরিয়া পাইবে।

যে সকল শিশু ও নারী নিরাশ্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আশ্রয়স্থল খুলিয়া সেগুলিকেও এমনি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইতে পারে। শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা চোখের সাম্নে দেখিতেছি, কেমন করিয়া ইউরোপীয় ও আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় আমাদের দেশের অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর নরনারীগণকে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ খুলিয়া দিয়া খৃষ্টধর্ম্মের নামে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের হাতের একটি সুশৃঙ্খল সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছে। অথচ আমরা নিজেরা কিছুই করি নাই। রাজনৈতিক সচেতনতার

একে জিনিষ ভাল, তারপর সবই স্বদেশী

বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ও অনুমোদিত।

ও, এম, সি, ইলেকট্রিক ফ্যান্

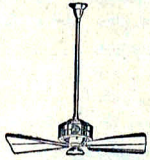

দুই বৎসরের জন্য গেরাণ্টী।

ও, এম, সি, ওটোমোবাইল ও ষ্টোরেজ ব্যাটারী

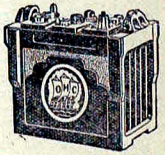

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

এজেণ্টস্:—

দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

৩৬এ এবং বি, প্রতাপাদিত্য রোড্

টেলিফোন:—সাউথ: ২৬৭৪ (২ লাইন)

টেলিগ্রাম:—"সেলাস।"

ব্রাঞ্চ—১১, ব্যাঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বে।

টেলিফোন:—৩১৩৯৪

টেলিগ্রাম:—"ওরিমারকো"।

সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা নিজেদের সে ত্রুটি পরিষ্কার অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমানে, দেশময় দুর্ভিক্ষ সঙ্কটের ফলে সমাজে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, নিপীড়িত আর্ত্তের দল শত সহস্রমুখে সাহায্যের জন্য কাঁদিতেছে, আজ যদি আমরা ঐ পদ্ধতির অনুকরণে সমাজ গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করি, তবে আজই প্রশস্ত সময়। শিশুসদনগুলিকে আদর্শ জাতীয়-শিক্ষাকেন্দ্রে ও নারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুটীরশিল্প ব্যবসায়কেন্দ্রে পরিণত করিলে বাংলার জাতীয়জীবনে নূতনরূপ ফুটিয়া উঠিবে।

অস্পষ্ট ইঙ্গিতের ভাবে এই যে কথাগুলি আলোচনা করিতেছি, চিন্তাশীল সেবাব্রতীগণ যদি এই নীতি গ্রহণ করেন, তবে ইহাকে বহুপথে বহুভাবে সম্প্রসারিত করিয়া লইবার সুযোগ তাঁহাদের হাতে। জাদুঘারী হইতে বাজার যদি নামিয়াও যায়, এমন কি, প্রাক্‌যুদ্ধ পর্ব্বের মতও সহজ হইয়া আসে, তথাপি আমাদের এ সমস্যাগুলিকে ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। কেন না, এ সমস্যা শুধু আজকার একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়, বাঙ্গালীর সমাজদেহে এ ব্যাধি অল্পবিস্তর বহু বৎসর ধরিয়াই দেখা দিয়াছে; আমরা আলস্য-ভরে চক্ষু বুঁজিয়া ছিলাম। আজ ইহা দুর্দ্দমনীয় করালরূপ লইয়া দেখা দিয়াছে বলিয়াই আমাদের মনোযোগ টানিয়া লইয়াছে, এই মাত্র তফাৎ। সুতরাং দুর্দ্দমনীয়তা প্রশমিত হইলেও রোগটি যাপ্য অবস্থায় রহিয়াই যাইবে। বেকার সমস্যাহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোচনীয় দুরবস্থা, শিক্ষা ও সমাজের গলদে বহু ভদ্র অভদ্র নারীর আজীবন নীরব লাঞ্ছনা শহরের রাজপথগুলিতে ভিক্ষুকের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, ইত্যাদি আমাদের দেশে 'ক্রনিক্' রোগের মত দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের স্থায়ী প্রতীকার চাই। হিটলার তাঁহার 'মাইন্ কাম্‌ফ্' নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন,—'বিজ্ঞানজগৎ প্লেগের প্রতীকারের ঔষধ কত সুন্দরভাবে আবিষ্কার করিয়াছে, টিউবারকুলোসিসের ঔষধ ততটা পারে নাই, তাহার কারণ, প্লেগ অকস্মাৎ মহামারীর প্রলয়রূপে দেখা দিয়া মানুষের চমক লাগাইয়া দেয়, আর টিউবারকুলোসিসের রোগী আড়ালে তিলে তিলে মরে, কেহ তেমন লক্ষ্যও করে না। মানুষের জাতীয় জীবনেও এমনিই হয়।'—উপমাটি বড়ই সুসঙ্গত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনের দিকে তাকাইয়াও ইহাই বুঝিতে পারি। অকস্মাৎ রাজকীয় সমারোহে যে বিপর্য্যয় আসে, তাহারই দিকে আমরা নজর দিই, আড়ালে ধীরে ধীরে সেই বিপর্য্যয়ই একটু একটু করিয়া প্রসারিত হইতেছে, ততক্ষণ খেয়াল করি না।

কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটের সাহায্যব্রতীগণ এবার হয়তো সজাগ ও অবহিত হইয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

জুপিটার—কাব্যগ্রন্থ। শ্রীমতী বাণী রায় প্রণীত। প্রকাশক: রঞ্জন প্রকাশালয়, প্রাপ্তিস্থান ২৫।২, মোহনবাগান রো, মূল্য দেড় টাকা। একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা 'জুপিটার' গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ক'রেছে কিনা জানি না, তবে তিনি যে স্বল্প কথায় কবির কবিতার ও বাক্যশক্তির যথার্থ পরিচিতি দিয়ে গেছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গুপ্ত মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে—কবিতায়, প্রধানতঃ লিরিক্ কবিতায় নিজের মনকে প্রকাশ করতে হয়। সেইজন্য অধিকাংশ নারী নিজের মনকে প্রকাশ ক'রতে না পেরে পুরুষ-বিলক্ষণ অনুভূতি ও দৃষ্টির অংশ দিয়ে যে কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা সার্থক হয়ে ওঠেনি।—কবি শ্রীমতী বাণী রায় কিন্তু এর চূড়ান্ত ব্যতিক্রম। 'নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টির অবিকৃত প্রকাশ যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম কথা এবং সে সাহস যে কেবল শক্তিশালী লেখকেরি থাকে, আর জুপিটারের কবি যে সে পরিচয় দিয়েছেন 'চেষ্টাকৃত বিদ্রোহের উৎসাহে নয়, সহজ স্বাভাবিকতায়'—তাতে সংশয়ের কিছু নেই।

'জুপিটারের কবিতাগুলির মালমশলা প্রধানতঃ বিদেশী'—ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিতেরা এদের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। পরিচয়ের বিস্তৃতি যেখানে আছে, উপভোগের মাত্রাও সেখানে বেশী; কিন্তু স্বল্পতা যেখানে বিদ্যমান, 'টীকাও' সেখানে প্রায় নিরর্থক। কলেজে অধীত ও অধ্যাপয়িতব্য বিদ্যার প্রকাশের (স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা মেকানিকাল) দোষ এই যে, কলেজের বাইরে এসে অধিকাংশ সময় সে আমাদের মনে স্থান পায় না। তাই তা নিয়ে কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টিও আমাদের মনে স্থান পাবে—সে আশা কম। তবুও 'জুপিটার' অনেক দাবী রাখে কারণ—

কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টির সময়ে লেখক পাঠককে আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন। পাঠককে চমকে দিতে চেষ্টা করেন। পাঠককে সত্যকার কিছু করে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন সময় আসে যে শক্তিশালী লেখক রচনাকালে পাঠকের অস্তিত্বই ভুলে যান—ফলে যে সার্থক সৃষ্টি হয় তাকে আমরা অধিকাংশ সময়ে বলি Classic। 'জুপিটারের অধিকাংশ কবিতা সমসাময়িক কবিতার মত পাঠককে কেবল-মাত্র চমকে দিতে চেষ্টা করে নি, নিজেদের সৃষ্টির সময়ে অধিকাংশ সময়ই পাঠকের অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিল—এটাই আমার বিশ্বাস।

অনেক সময় অনেক প্রতিভাসম্পন্ন কবির কবিতার শক্তি গৌণবিষয়ের অলঙ্কারে আপ্যায়িত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে কবিতার সত্যকারের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 'জুপিটারের' কবিতাগুলি বিশেষ করে 'জুপিটার', 'চরম বিচারের দিন' ও 'রাখী পূর্ণিমা' সেই দোষ হ'তে মুক্ত।

অলঙ্কার সংযম অনেক সময় স্বাভাবিক; কাব্যে ঐশ্বর্য্য তেমনি অধিকাংশ সময়ে সহজ সুন্দর। উর্ব্বশীর নৃত্যের পক্ষে যেমন নূপুর নিক্কণ অপরিহার্য্য তেমনি কবির অধিকাংশ কবিতায় যে ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে পাই তা অতিরঞ্জিত নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়। বিদেশী পুরাণ থেকে মালমশলা প্রধানতঃ সংগ্রহ করলেও কবির পক্ষে সব সময় ঐতেই ন্যস্ত থাকা অসম্ভব হয়েছে। এর সহজ কারণ এই যে—যে প্রিমিটিভ্ মন দিয়ে অতি প্রাচীনেরা এই সব কল্পনা করতেন, কবির সে মন নেই, থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং অনেক সময়

স্থির বিশ্বাসের অভাবে তিনি অনেক কিছুই হাতড়েছেন। যেমন—

"জুপিটার কেবা? ওহো, সে 'পেগান?
মরে গেছে বহুদিন,
ইস্কিলাসের মৃত্যুর সাথে হচ্ছেছে তার।"
"ক্রাইষ্ট কি আছে?
খ্রীষ্টধর্ম স্বর্গে চলিছে বুঝি?"
"মহাযুদ্ধের বিষম মাঝে আবার মরেছে যেন্।"……
…হা হতাদৃষ্ট! দেবহীন নাকি দেবের আবাস তবে?

('চরম বিচারের দিন')

ভক্তিভাব ও বিশ্বাসের বলেই অনেকসময় কাব্য অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে।

"যদি আমি আঁকি, আমি কবি,
হে ঈশ্বর সমকক্ষ তব
সৃজন-লীলায় মম,
যদি আমি আঁকি—
হস্তপদ লৌহবদ্ধ বিভূষিত আঁখি
তোমার সে উন্মাদের বিশ্রাম-আগারে?—"

(নরক)

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাব্যে এই ধরণের বিদ্রোহ সমসাময়িক কবিতায় নূতন নয়—

"আমি যে রবির কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার
তবু কাব্য রচিলাম এই সব বিদ্রোহ আমার।"

(বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধ বোস)

ছন্দ, রূপক, ধ্বনি প্রভৃতি মিশে জুপিটারের কবিতাগুলিকে এমন একটা সুর দিয়েছে যে—কোন বিভাষীর কাছেও এগুলি ঠিকমত পড়তে পারলে সে নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করবে। যেমন Coleridge এর কবিতা ইংরাজী অনভিজ্ঞেরাও শুনতে ভালবাসেন। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর—

"…আজও সেই মিশরের উদ্দাম তটিনী
আজও করে ঝলমল জ্যোৎস্নার জালে;
শীতল বাতাস আসে,
লক্ষ পুষ্প হাসে,
মরুভূমি বালুকার মেল গলা-সোনা।
ফিংস, তুমি বলে দাও দেখেছ তাহারে,
যে জন করেছ ভুল?
আজও ভুল করে,
আজও সে চুম্বন আঁকে 'হামীর' অধরে,
আমি তাই ফিরি একা প্রাচীন মিশরে।"

(একটি বিয়োগান্ত নাটিকা)

সমসাময়িক কবিতায় এ লক্ষণ একেবারে নেই বল্লেই হয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেছেন যে সমসাময়িক কোন গ্রন্থে সমালোচনা করবার সময় অন্ততঃ ছয় মাস অপেক্ষা করবে, তারপর দেখবে যে তা বাড়ী পুরাণো কাগজের ঝুড়িতে ও ডাষ্টবিনে পড়ে আছে। অতএব আর সমালোচনার প্রয়োজনই হবে না। একথা সমসাময়িক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে অধিকাংশ সময় প্রযোজ্য হলেও, 'জুপিটার' সম্বন্ধে কোনরূপেই প্রযোজ্য নয়—একথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

কুমার অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

শারদীয়া সম্মেলন

গত ৪ঠা ডিসেম্বর "মন্দিরা" কার্য্যালয়ে একটি প্রীতি সম্মেলন হয়েছিল। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রধান অতিথিরূপে এসেছিলেন। প্রায় দুশ'র অধিক অতিথি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের অনবদ্য কণ্ঠসঙ্গীত এই সম্মেলনকে মুগ্ধ করে রেখেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। "মন্দিরা" কর্তৃপক্ষ এই সম্মেলনে তাঁদের দুঃসত্রে ১০০৲ চাঁদা দেন; সভায় উপস্থিত অনেকেই চাঁদা দিয়ে মন্দিরা কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করেন। যাঁরা এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিলেন তাঁদের সবাইকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মানকুমারী বসু

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি", "বীরকুমার বধ" রচয়িত্রী যশস্বিনী কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে মানকুমারী বসুর একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। তাঁর পরলোক গমনে বাঙ্গালা সাহিত্য যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়দের আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

বাঙ্গলার সমাজ ও বর্তমান দুরবস্থা

বর্তমান দুরবস্থায় বাঙ্গলার সমাজ-জীবন যে আঘাত পেয়েছে তার থেকে কোন দিনও সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতের শাসনভার হাতে পেল সেদিন থেকে আমাদের সমাজ-জীবনে যে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হয়েছিল ধীরে ধীরে তার শিকড় আমাদের সমাজ-সৌধের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান দুর্ভিক্ষে তাই আমাদের জীবন এমন দুরবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা করতেই শঙ্কা হয়। এই সমাজ-ধ্বংস-পর্বের প্রথম আঘাত পড়েছে শিশু-বৃদ্ধ-নারীর উপর। এরাই সব চাইতে দুর্বল, আঘাতও তাই এদের উপরেই সবার আগে এসে পড়েছে। দুর্ভিক্ষের আঘাত কেবল অকাল মৃত্যুতেই পর্যবসিত হয় না, জাতির মেরুদণ্ড বহু বৎসরের জন্য এর আঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়। যেখানে একজন মানুষ মারা যায় সেখানে অন্ততঃ পাঁচজন হয় সারা জীবনের মত পঙ্গু। তারপর নারী। মফঃস্বল থেকে সংবাদ আসছে নৌকা বোঝাই নারী সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মত বিকি-কিনি হচ্ছে। বাঙ্গালার সমাজ জীবনের উপর এর প্রতিক্রিয়া যে কি হবে তা' সকলেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এর প্রতীকারের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। যে সব কংগ্রেস কর্মী এখনও কারাগারের বাইরে আছেন বা সেখান থেকে ফিরে এসেছেন তাঁরা এখনই এ বিষয়ে অবহিত হোন।

ওয়াভেল সাহেবের বক্তৃতা

প্রতি বৎসর বড়দিনের কিছু পূর্বে ভারতের বড়লাট সাহেব বিলাতী বণিকসভাগুলির সম্মেলনেএকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় সাধারণতঃ সমগ্র বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য ও আলোচনা থাকে। অনেক সময় ভবিষ্যৎ সরকারী কর্মপদ্ধতির আভাসও এই বক্তৃতায় পাওয়া যায়। লর্ড ওয়াভেল এ বছর নতুন বড়লাট হয়ে এসেছেন। এসেই তিনি লর্ড লিনলিথগোর মত দিল্লীর তক্ততাউসে চেপে বসে' না থেকে বাঙ্গলা দেশে দৌড়ে এসেছেন এবং অন্ততঃ কলকাতা সহরের বুকে দুর্ভিক্ষ যেভাবে উলঙ্গ আত্মবিকাশ করেছিল সেটা বন্ধ করেছেন। এ সব কারণে সমগ্র দেশের মনোভাব তাঁর প্রতি যথেষ্ট অনুকূল হয়েছিল। এদিকে একদল লোক প্রচার কর্ত্তে সুরু করেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে রাজী আছেন। বণিক সমিতির সভায় তাঁর বক্তৃতা

থেকে এজন্য অনেকেই অনেক রকম আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে ওয়াভেল সাহেব নিরাশ করেছেন। দুর্ভিক্ষ দমন সম্বন্ধে তিনি বেশ সহজ ও সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। বলবার এক্তিয়ার নেই বলেই কথা বলেন নাই, না, চার্চিল সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতের মিল আছে বলেই তিনি ওবিষয়ে চুপ করেছিলেন,—সেটা অবশ্য দেশের লোকে জানে না। আমাদের মনে হয় যে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চার্চিল-আমেরীর সঙ্গে একমত। তা না হোলে ওয়াভেল সাহেব ভারতের তক্তত্তাউসে বসতেন না। এই যুদ্ধের সময়ে যখন ভারতবর্ষ সমগ্র প্রাচ্যের যুদ্ধ চালাবার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সময় এখানে এমন কোন লোকই চার্চিল কোম্পানী পাঠাতে পারেন না যাঁর সঙ্গে তাঁদের মতের কোন রকম অমিল থাকে। ক্রিপস্ সাহেব প্রথমটাতে যে প্রস্তাব কংগ্রেসের কাছে দিয়েছিলেন তার বিরোধিতা সব চাইতে তীব্রভাবে করেছিলেন বলে যাদের নাম বাইরে প্রকাশ তাদের ভেতর ওয়াভেল সাহেবও নাকি একজন। তাই যদি সত্য হয় তা হলে ওয়াভেল সাহেব ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করবেন বলে' যাঁরা আশা করেন তাঁদের নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

বাঙ্গলায় অষ্ট্রেলিয় লাট

মিঃ রিচার্ড কেসি পরলোকগত স্যর জন হার্বার্টের পরিত্যক্ত লাট গদিতে নিযুক্ত হয়েছেন। মিঃ কেসি অষ্ট্রেলিয় কূটনীতিক মহলে প্রতিপত্তিশালী সদস্য। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অষ্ট্রেলিয় দূতের কাজ খুব যোগ্যতার সঙ্গে করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতায় চার্চিল সাহেব এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে অষ্ট্রেলিয়ার সম্মতি না থাকলেও এক রকম জোর করেই ব্রিটিশ সরকার কেসিকে তাঁদের মধ্য প্রাচ্যের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছিলেন। এ হতে সহজেই বোঝা যায় যে কেসির হাতে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল সাহেবদের স্বার্থ সুরক্ষিতই থাকবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। বাঙ্গলা দেশ এখন নানা দিক দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা মস্ত উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘাঁটিতে তাই একজন কূটনীতিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদীকে বসান প্রয়োজন এবং সেজন্যই যে কেসি সাহেবকে এই ঘাঁটিতে বসান হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সার্ভেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় কেসির নিয়োগে ভারতবর্ষকে অপমানিত করা হয়েছে বলে সংবাদপত্রের মারফৎ ক্ষোভ জানিয়েছেন। কেসি অষ্ট্রেলিয়ানিবাসী এবং অষ্ট্রেলিয়াতে এসিয়ার কোন লোককেই স্থায়ীভাবে বাস করতে দেওয়া হয় না। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বেতকায়দের সংখ্যা খুবই কম এবং বহু জায়গাই খালি পড়ে' রয়েছে তবু সেখানে এসিয়াবাসীকে বসবাস করতে দেওয়া হয় না। এই উৎকট শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের দেশের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিককে বাঙ্গলা দেশের লাট পদে বসানই কেবল বাঙ্গলাকে নয় সমস্ত এসিয়ার লোককে অপমান করা। একথা চার্চিল সাহেবের মত বুদ্ধিমান লোক বোঝেন না বলা চলে না। আমাদের মনে হয় যে তিনি ইচ্ছে করেই কেসিকে এ সময়ে বাঙ্গলার লাট করে' পাঠিয়েছেন।

"মন্দিরা"র বর্ত্তমান সংখ্যা

"মন্দিরা"র বর্ত্তমান সংখ্যার একটি বিশিষ্টতা এই যে এতে সমস্ত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি বাঙ্গলার বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যসেবিকাদের লেখা। আমরা এমন একটি লেখিকা-গোষ্ঠী গড়ে' তুলতে চাই যাঁদের সাহায্যে বাংলা সাহিত্য সব দিক দিয়েই উপকৃত হতে পারে। এবার যাঁরা আমাদের লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করি তাঁরা ভবিষ্যতেও আমাদের নিয়মিত সাহায্য করবেন। শ্রীযুক্ত শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস "জীবন্মৃত" ও শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধ "প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি" এ সংখ্যায় গেল না। মাঘ সংখ্যা থেকে আবার এ দুটি নিয়মিত বেরুবে।

ত্রুটী স্বীকার

এই সংখ্যাটিকে আয়তনে বড় করতে ও মহিলা লেখিকাদের লেখা সংগ্রহ করিবার জন্য সময়মত বের করতে না পেরে লজ্জিত আছি।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

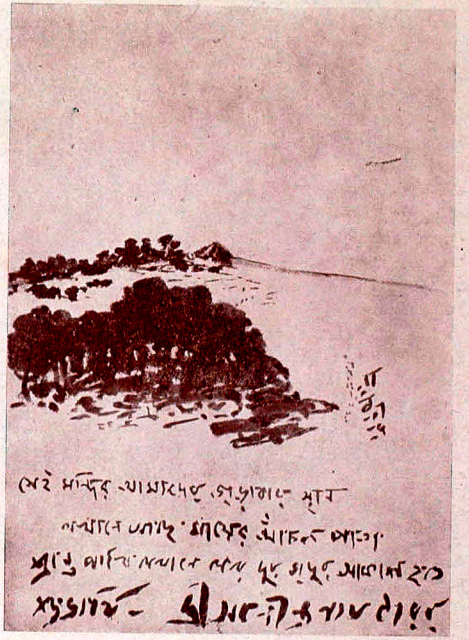

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

জলরঙ চিত্র—

কার্ল্টন ভ্রাতা

কেন্দ্র—ফিরিঙ্গি কবরস্থান